বাঙালির
ইতিকথা
খন্দকার মাহমুদুল হাসান

এমন একটা সময় ছিল যখন চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র কিছু ছিল না। তারপর একে একে সৃষ্টি হলো সবই। শেষে এই পৃথিবীতে এল মানুষ। সৃষ্টি হলো বাঙালিসহ নানা জাতি। প্রাচীন সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙালি জাতির বসবাসের প্রধান জায়গা হলো বাংলাদেশ। হাজার হাজার বছর আগে এদেশে ধারাবাহিকভাবে মানুষের বসতি স্থাপন এবং সভ্য হয়ে ওঠার কাহিনী থেকে শুরু করে রাজা-মহারাজা, প্রাচীন রাজ্য ও হারিয়ে যাওয়া শহরের বিবরণ আছে এই বইয়ে। তবে শুধু সভ্যতার কারণেই নয়, বাঙালির বীরত্বের ইতিহাসও সুদীর্ঘ। যুগ-যুগান্তরের সেই ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবের অধ্যায় হলো মহান মুক্তিযুদ্ধ। লড়াই-সংগ্রামের দীর্ঘ পথ বেয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সেই কাহিনীও উঠে এসেছে এ বইয়ে। মোটকথা, মহাবিশ্বের সৃষ্টি থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় পর্যন্ত ধারাবাহিক ঘটনাগুলো গল্পের আদলে সহজ ভাষায় এ বইয়ে তুলে ধরেছেন খ্যাতিমান শিশু-সাহিত্যিক ও গবেষক খন্দকার মাহমুদুল হাসান।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

অগ্রণী ব্যাংক শিশু-সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত শিশু-সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত গবেষক খন্দকার মাহমুদুল হাসান (২৫ আগস্ট, ১৯৫৯ -) রহস্যাবৃত ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে প্রবলভাবে উৎসাহী। তিনি বাংলা একাডেমীর সদস্য। ইতিহাস একাডেমীর আজীবন সদস্য তিনি। কঠিন বিষয়াবলিকে নিবিড় তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি একেবারে সহজবোধ্য ভাষায় পাঠকের জন্যে উপস্থাপনে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। প্রতিভাবান, পরিশ্রমী ও অনুসন্ধিৎসু এই লেখকের ষাটোর্ধ গ্রন্থের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গবেষণা গ্রন্থ। প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক এসব গ্রন্থের প্রধান ঝোঁক ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচন। অপরাপর গ্রন্থের সিংহভাগ শিশু-সাহিত্যের। রহস্যোপন্যাস, হাসির গল্প, শিকার কাহিনী, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, সায়েন্স ফিকশন, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক বই তিনি ছোটদের জন্যে লিখেছেন। ইতিহাসের বাস্তবতা, প্রকৃতির রূপময়তা ও শ্রমজীবী মানুষের দ্বন্দ্বমুখর কঠোর জীবন সংগ্রাম তাঁর রচনার প্রধান উপজীব্য। জীবন ও প্রকৃতির এই নিখুঁত রূপকারের কলমের ছোঁয়ায় ইতিহাসের চরিত্ররা পাঠকের সামনে উঠে আসে জীবন্ত হয়ে। তাঁর খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণাগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের প্রথম ও প্রাচীন, প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতা, ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও প্রত্নকীর্তি, চলচ্চিত্র, প্রথম বাংলাদেশ কোষ-১, প্রাচীন বাংলার পথে প্রান্তরে, প্রথম বাংলাদেশ কোষ-২, মুদ্রা : ইতিহাস ও সংগ্রহ, প্রাচীন বাংলার ধুলোমাখা পথে, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান, হিব্রু থেকে ইহুদি প্রভৃতি। শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা বইয়ের মধ্যে রয়েছে পাহাড় মরু সাগর নদী, জীব জগতের কথা, আফ্রিকার বিভীষিকা, নির্বাচিত কিশোর সংকলন, হারানো পৃথিবীর আশ্চর্য কাহিনী, উ-তে উট, রিংকু ও তার গোয়েন্দাদল, দুঃসাহসী মুক্তিসেনা, দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা দুঃসাহসী অভিযান, আদিম মানুষের গল্প, সুন্দরবনে জাহাজ রহস্য, নেপাল রহস্য, আজব দ্বীপে খোকাবাবু প্রভৃতি।

জন্মস্থান রংপুর। পৈত্রিক নিবাস পাবনা। বর্তমানে স্থায়ী নিবাস ঢাকা শহরে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতিছাত্রের মা রওশন আরা বেগম ও বাবা খন্দকার আজমল হক।

প্রথম প্রকাশ

অমর একুশে বইমেলা ২০০৮, ফাল্গুন ১৪১৪

প্রকাশক

প্রকৌ. মোঃ মেহেদী হাসান

বাংলাপ্রকাশ

৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট

ঢাকা-১১০০

E-mail banglaprokash@gmail.com

পরিবেশক

লেকচার পাবলিকেশন্স লিঃ

৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বিশাল বুক কমপ্লেক্স

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৭০৯০৯, ৭১২৫২২৩

বিদেশে পরিবেশক

সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ভারত

রেইনবো বুকস, মুম্বাই, ভারত

প্রচ্ছদ

ধ্রুব এষ

মুদ্রণ

কমলা প্রিন্টার্স

পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

Bangalir Itikatha by Khandakar Mahmudul Hasson Published by Engr. Md. Mehedi Hasan, Banglaprokash (A concern of Omicon Group), 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100. Price Tk. 100.00 Only. US $ 6.00

ISBN 984-300-000-510-8

উৎসর্গ

শাহ্‌নেওয়াজ চৌধুরী
কামাল হোসাইন
স্নেহভাজনেষু

সূ চি প ত্র

লেখকের কথা

চরকির মতো বনবন করে মাথার মধ্যে ঘুরছিল ভাবনাটা অনেক দিন থেকেই। সে ভাবনা মাথার ভেতর ঘুরতে ঘুরতেই নড়েচড়ে উঠল হাত। সচল হয়ে উঠল কলম। কাগজের ওপর এঁকেবেঁকে দৌড়ে চলল সে। বুঝতেই চাইল না যে, মেরুদণ্ডের হাড় ক্ষয়েছে, পরিশ্রমের ক্ষমতাও কমেছে শরীরের। এরই মধ্যে কারো কারো উৎসাহটা উস্কানির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। শেষমেশ যা হবার তাই হল। জন্ম নিল নতুন একটাই বই।

বিশ্বসৃষ্টির পর ধারাবাহিক পরিবর্তনের পথ বেয়ে কীভাবে সৃষ্টি হল বাংলাদেশের ভূমি, পাহাড়, বনবনানী। এদেশে কখন কখন, কোন কোন জাতির মানুষ এসেছে এবং তাদের ভেতর থেকেই কী করে বাঙালি জাতির জন্ম হল তার একটা ছবিও উঠে এল বইটার পাতায়। এছাড়াও এই জাতির বড় বড় কীর্তি কী কী, সেগুলো গড়ার পেছনের ইতিহাসই বা কী তারও একটা চিত্রকল্প রইল।

এককথায়, বিশ্বের সৃষ্টি থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ধারাবাহিক ঘটনাগুলো নবীন পাঠকদের উপযোগী করে তুলে ধরার প্রবল একটা ইচ্ছের ফলশ্রুতি এ বই। বর্ণনার সময় মজবুত সব শব্দকে দূরে তাড়িয়ে রাখার জন্যে মনের ভেতরেই রেখেছিলাম সতর্ক পাহারাদারকে। সে পাহারাদার কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছে তা বিচার করার মতো যোগ্য বিচারক পাঠকদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছেন। মশলা দিয়ে হরীতকী পরিবেশন নয়, সত্যিকার মজাদার খাবার পেয়ে পাঠক খুশি হলে ধন্য হবে এ লেখা।

এ ঘটনার অনুঘটকের নাম হুমায়ূন কবীর ঢালী। অনুলেখকদের নাম ওয়াসীম আহমেদ ও শাহনাজ পারভীন। এ শিশু-গ্রন্থের নাম রেখেছেন ফারুক নওয়াজ। স্মৃতি হাতড়ে লিখেছি এ বই। সে স্মৃতিতে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, নীহার রঞ্জন রায়, মোঃ মোশারফ হোসেন, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, অজয় রায়, আবদুল মমিন চৌধুরী ও খন্দকার মাহমুদুল হাসানসহ অনেক লেখকের বই আছে। নিজেকে বাদে তালিকার আর সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বিনম্রচিত্তে। কিশোর তারকালোক, টইটম্বুর ও ছোটদের পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি লেখাও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এ বইয়ে।

বইটিতে ব্যবহৃত অনেক ছবি নিজের তোলা। কিছু ছবি নেয়া হয়েছে ইন্টারনেট থেকে। তবে অন্যান্য ছবির জানা-অজানা উৎসসহ শিল্পী-আলোকচিত্রীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। ভালোবাসা সবার জন্যে।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ — খন্দকার মাহমুদুল হাসান

সেকালের গল্প

সেই আদ্যিকালের কথা। সে যে কতকাল আগের কথা তা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। নিদেনপক্ষে ১৫০০ কোটি বছর আগের কথা তো বটেই। এমনকী এর চেয়েও আগেকার কথা হতে পারে। তখন এই পৃথিবী ছিল না, চাঁদ ছিল না, গ্রহ-নক্ষত্র, তারা-সূর্য কিচ্ছু ছিল না। সেই মহাঅতীতকালেই সৃষ্টি হয়েছিল এ মহাবিশ্ব। সে এক মজার কাহিনীই বটে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি

তবে এই মহাবিশ্ব জিনিসটা যে কী তা শুনলেও কিন্তু ভিড়মি খেতে হবে। আমাদের এই পৃথিবীটা তো বিশ্ব। তাহলে মহাবিশ্বটা কী? এ হল সেই জিনিস যার মধ্যে ঢুকে আছে বহু বিশ্ব। আসলে চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সব মিলিয়েই এটা। এই যে গাছপালা, ফুল-পাখি, রাতের আকাশ ভরা তারার মেলা, দিনের আকাশে রাজত্ব করা দাপুটে সূর্য– সব মিলিয়েই মহাবিশ্ব। এ যে কতবড় তা কল্পনা করার সাধ্য আমাদের নেই। এই মহাবিশ্বের সবটা সম্পর্কে যে আমরা জানি তা মোটেই নয়, তবে যতটুকু সম্পর্কে জানি সেটাকেই আমরা মহাবিশ্ব বলি। আর এই মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটা ছড়িয়ে রয়েছে মহাকাশ জুড়ে। মাথা উঁচিয়ে আমরা যে আকাশ দেখি তার কোনো সীমা কিন্তু মানুষ টেনে শেষ করতে পারেনি। তো, এই মহাবিশ্বে বহুকোটি তারা আছে। সূর্য হল তেমন একটি তারা। তবে তারা হিসেবে সূর্য কিন্তু তেমন একটা বড় নয়। এর চেয়ে ঢের বড় তারা অনেক আছে, অবশ্য আমাদের কাছে সূর্যই অনেক বড়। এই সূর্য যে কী করে সৃষ্টি হয়েছিল তা কিন্তু এখনও অনেকটা রহস্যের ধোঁয়াতে ঢাকা রয়েছে। তবে মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, চারশো ষাট কোটি বছরেরও আগে সৃষ্টি

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

হয়েছিল সূর্য। মহাকাশের ভেতরে ধুলো এবং গ্যাসের পিন্ড অনাদিকাল ধরে ঘুরতে ঘুরতে একসময় সৃষ্টি হয়েছিল সূর্য। আমাদের এই পৃথিবী হল সূর্যের একটি গ্রহ যা ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে এবং এই পৃথিবীরও সৃষ্টি হয়েছে চারশো পঞ্চাশ কোটি বছরেরও বেশি আগে।

যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল তখন কিন্তু এটা সূর্যের মতোই গনগনে গরম ছিল। এটাও ছিল আগুনেরই একটা পিণ্ড। তারপর কেটে গেল বহু কোটি বছর। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হল পৃথিবী। সৃষ্টি হল পাহাড়-পর্বত। মেঘ এল আকাশে। ঝরলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি। মুহূর্মুহু বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর আওয়াজে কেঁপে উঠলো দুনিয়া। ভয়ঙ্কর ঝড় বয়ে যেতে লাগলো পৃথিবীর ওপর দিয়ে। সৃষ্টি হলো সাগর-মহাসাগর। তাতে উঠলো পাহাড় সমান ঢেউ। সে সাংঘাতিক অবস্থা! তবে ভাগ্যিস পৃথিবীতে তখনও জনপ্রাণীর লেশমাত্র ছিল না। থাকলে ঐ অবস্থায় পড়ে কবেই তারা ভ্যানিশ হয়ে যেত। বহুবছর ধরে চলল এই মহাঘূর্ণিপাক। একসময় ঝড় বৃষ্টি থামল বটে কিন্তু পৃথিবী পুরাপু-রি যে শান্ত হল তা বলা যাবে না, পৃথিবীর নানা জায়গায় গড়ে ওঠা আগ্নেয়গিরির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল আগুনের হল্‌কা আর ভীষণ গরম পাথর, গুড়-গুড় শব্দে কেঁপে উঠতে লাগল পৃথিবী। আগুন আর গরমে সে কী দুর্বিষহ অবস্থা! সেই গরমের রাজত্বে আবার দেখা দিল নয়া বিপদ। আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল পৃথিবীর আকাশ। সেই ধোঁয়ার মেঘে পৃথিবী ঢাকা পড়ে রইল বহুকাল। এমনতর নানা দূর্বিপাকে পার হয়ে গেল কোটি কোটি বছর। এরই মধ্যে পৃথিবীতে এসেছে গাছপালা। এসেছে প্রাণী।

আদ্যিকালে পৃথিবীতে স্থলভাগ কিন্তু একটা জায়গাতেই ছিল। আর ছিল সব সমুদ্র। সেকালে আজকের দিনের মতো এতোগুলো মহাদেশ ছিল না। ছিল সেই একটা মাত্র মহাদেশ যার নাম পাঙ্গিয়া। মহাদেশটা ভাসছিল প্যান্থালাসা নামক মহাসাগরের ওপরে। ধীরে ধীরে সেই মহাদেশ ভেঙে সৃষ্টি হল দুটো আলাদা মহাদেশের। এর উত্তরেরটির নাম লরেশিয়া ও দক্ষিণেরটির নাম গন্ডোয়ানাল্যান্ড।

মহাসংঘর্ষের ইতিকথা

কোটি কোটি বছর আগের কথা। পৃথিবীতে এক সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটেছিল সে সময়ে। মহাসাগরের অথৈ জল কেটে সরতে শুরু করেছিল পৃথিবীর ভূখণ্ডসমূহ। তখন এক অভাবিত ঘটনায় আচম্বিতে কেঁপে উঠেছিল দুনিয়া। ভয়ঙ্কর এক সংঘর্ষ ঘটেছিল বিপরীত দিক থেকে ধেয়ে আসা
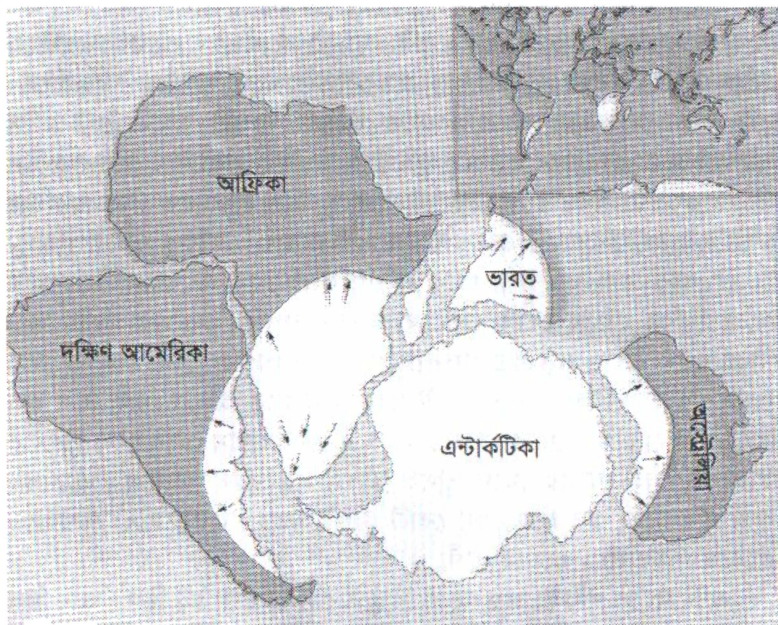
পৃথিবীর ভূখণ্ডসমূহের স্থান পরিবর্তন

ভূখণ্ডসমূহের মধ্যে। সেই মহাসংঘর্ষের ফলেই পুরোপুরি বদলে গেল দুনিয়ার চেহারা– মানচিত্র সবই। সেই ভীষণ দুর্দৈবের কালেই মহাসাগরের গভীর থেকে দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালো এক মহা পর্বতমালা। নাম তার হিমালয়। ভারতের পূর্বপ্রান্ত থেকে যাত্রা করে এই পর্বতমালা গিয়ে পৌঁছেছে আফগানিস্তানের সীমানা অব্দি। পথে সে স্পর্শ করেছে ভারত, চীন, নেপাল, ভুটান, তিব্বত ও পাকিস্তানকে। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টও এই পর্বতমালাতেই। তিব্বত

(চীন) ও নেপালের সাধারণ সীমান্তে এই শৃঙ্গটি অবস্থিত। তবে মজার ব্যাপার হল, আকাশ ছোঁয়া এই পর্বত শিখর যে পাথরে তৈরি, তার সৃষ্টি কিন্তু হয়েছিল সাগরতলে। বহু কোটি বছর ধরে সাগরের মৃত প্রাণীদেহের চুনজাতীয় পদার্থ (ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ) জমে এমন পাথর বা শিলার সৃষ্টি হয়েছিল। মহাসংঘর্ষের কালে মহাসমুদ্রের ভেতর থেকে সেই শিলা বেরিয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছিল পর্বতশীর্ষে। শুধু তাই নয়, কোটি কোটি বছর আগেকার সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম বা ফসিলও পাওয়া গেছে ওই পর্বতের আনাচে কানাচে। কী বিস্ময়কর ব্যাপার, তাই না? তো, হিমালয় যখন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল, পৃথিবীতে তখনও মানুষের আবির্ভাব হয়নি। দুনিয়ার বহু জায়গাই তখনও ছিল সাগরের অথৈ জলের নিচে। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশও তখন সাগরতলে লুকিয়ে ছিল। এরপর কেটে গেল কোটি কোটি বছর। বাংলাদেশের উত্তরভাগের ওপর দিয়ে বয়ে চলতে লাগল আসাম সাগরের প্রবল ঢেউ। তবে একই সাথে ঘটতে লাগল ভূমির পরিবর্তন। পার্বত্যাঞ্চল ও উঁচু ভূমি থেকে পানির স্রোতের সাথে ভেসে আসতে লাগল

মহাসংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এ পর্বতমালা

বালুর কণা, মাটি, নুড়ি পাথর এসব। সাগরের প্রাণী আর উদ্ভিদের মৃতদেহ থিতিয়ে পড়ে জমা হতে লাগল সেসবের সাথে। কালক্রমে সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে সৃষ্টি হল মাটি– বাংলাদেশের মাটি। তবে সেই বাংলাদেশের সাথে একালের বাংলাদেশের চেহারা-আকৃতিতে কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কেউ যদি প্রশ্ন করে বাংলাদেশের কোন কোন এলাকার মাটি সবচেয়ে পুরনো, তাহলে এর একটা জবাব কিন্তু দেয়া যায়। একেবারে সোজাসাপ্টা জবাব, চুলচেরা নয়– আবার ভুলে ভরা জবাবও নয়। সেটি হল– যেসব এলাকায় লালমাটি আছে সেসব এলাকাই সবচেয়ে প্রাচীন। কোথায় কোথায় লালমাটি আছে? এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে বরেন্দ্রভূমির নাম। বরেন্দ্রভূমি কোথায়? বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর এই পাঁচ জেলার এলাকা মিলিয়ে উত্তরাঞ্চল গঠিত। একে উত্তরবঙ্গও বলে। উত্তরবঙ্গ মানে বঙ্গ বা বাংলার উত্তরাঞ্চল। তবে বাংলাদেশের বাইরেও কিন্তু উত্তরাঞ্চল আছে– আছে উত্তরবঙ্গও। সেই উত্তরবঙ্গ এখন ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গে। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ সেই উত্তরবঙ্গের ভেতরে পড়েছে।

আরারও একটু শোনা যাক সেই বরেন্দ্রভূমির কথা। বরেন্দ্রভূমির মাটি ও ভূপ্রকৃতির কিন্তু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার প্রত্যন্ত পল্লীতে ঘুরে বেড়ানোর সময় এ বৈশিষ্ট্য দেখে বহুবার মোহিত হয়েছি। যে দেখবে সে-ই হবে। পথের দুধারে পাহাড়ের ঢালের মতো উঠে গেছে ভূমি। তার গায়ে গায়ে থাকে থাকে বসানো ফসলের ক্ষেত। আর মাটির রং হল লাল। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, উত্তরবঙ্গের সব জায়গার মাটিই লাল নয় এবং পরবর্তীকালের ভূমিও উত্তরবঙ্গে আছে।

উত্তরাঞ্চল ছাড়াও টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের মধুপুর গড়, বৃহত্তর ঢাকার ভাওয়াল গড়, বৃহত্তর ময়মনসিংহের গারো পাহাড় এলাকা, কুমিল্লার লালমাই পাহাড় এলাকা, সিলেটের পাহাড় এলাকা, চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় এলাকা লাল মাটিতে তৈরি। এছাড়াও ভারতের ছোট নাগপুর পার্বত্য মালভূমিও অনেক প্রাচীন মাটিতে তৈরি। এর মধ্যে প্রাচীনতম অঞ্চলের সৃষ্টিকাল নির্ধারিত হয়েছে দশ লক্ষ থেকে সাড়ে সাত কোটি বছরের মধ্যে।

এর ভূতাত্ত্বিক শ্রেণী নির্ধারিত হয়েছে টারশিয়ারি যুগে সৃষ্ট শিলা। মোটামুটিভাবে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট-ময়মনসিংহের পাহাড়ি এলাকা, পশ্চিমাংশের রাজমহল, সাঁওতালভূম, সিংভূম, ধলভূম, মানভূম ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলের গৌরিক মালভূমি এবং উত্তরের দার্জিলিং হল অবিভক্ত বাংলা এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন অঞ্চল। তার মানে অবিভক্ত বাংলার মধ্যে এসব এলাকার মাটিই প্রথম জেগে উঠেছিল।

এরপর দশ হাজার থেকে দশ লক্ষ বছরের মধ্যে প্লাইসটোসিন কালের পলিতে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি, ভাওয়াল ও মধুপুর গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড়। ভাওয়াল অঞ্চলের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের উয়ারি-বটেশ্বর একটি বিখ্যাত স্থান এবং এটিও লালমাটি দিয়ে গড়া। এমনকী ঢাকা শহরের অনেক স্থানই লালমাটিতে গড়া।

এরপরে আসে পলিমাটিতে গড়া ভূমি, কিছু পলিমাটির জায়গা বেশি পুরাতন এবং কিছু জায়গা তুলনামূলক নবীন। প্রাচীনতর জায়গাগুলো তুলনামূলকভাবে উঁচু। পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁ জেলার অনেক স্থান, বৃহত্তর পাবনা জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ, বৃহত্তর রংপুরের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ বাদে সব স্থান, বৃহত্তর রাজশাহীর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বগুড়ার করোতোয়া নদীর পূর্ব তীরের কিছু এলাকা এবং বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালি, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, বৃহত্তর সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর দোঁয়াশ মাটিতে গড়া এসব জায়গার চেয়েও পরে গড়ে উঠেছে পলিমাটিতে গড়া নিচু জমি। সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে এমন নিচু জমি। মোটামুটিভাবে দশ হাজার বছরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পলিতে গড়া এসব নিম্নভূমি। এমন ভূমি গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলছেই। এ দেশের নদীগুলোতে এমনকী সাগরের মোহনাতেও অব্যাহতভাবে চর পড়ছেই। আবার বহু চর নিত্যই ভেঙেও যাচ্ছে। নদী-প্রবাহিত পলিমাটির এ খেলা নিত্যদিনের।

যেহেতু লালমাটিতে তৈরি জায়গাই হল বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো জায়গা, তাই এদেশের মানুষের আবির্ভাবও প্রথমে এ এলাকাতেই হয়েছিল। হবিগঞ্জের চাকলাপুঞ্জি চা বাগান, কুমিল্লার লালমাই এলাকা, নরসিংদীর উয়ারি-বটেশ্বর ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, বৃহত্তর নোয়াখালির ছাগলনাইয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি এলাকায় প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে।

এ সমস্ত এলাকাই হয় লালমাটি এলাকা অথবা লালমাটি এলাকার সংলগ্ন।

এদেশে প্রাচীন সভ্যতার যত নিদর্শন পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই লালমাটি এলাকায়। নরসিংদীর উয়ারি-বটেশ্বর ও কুমিল্লার লালমাটি-ময়নামতি ছাড়া বেশি প্রাচীনকালের নিদর্শনের বেশির ভাগই পাওয়া গেছে বরেন্দ্রভূমিতে। তার মানে দাঁড়ায়, বাংলাদেশে প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষের বসবাস ছিল এবং সুপ্রাচীনকাল থেকেই এদেশে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তবে প্রস্তর যুগে এবং সভ্যতা গড়ার দিনগুলোতে এদেশের বেশির ভাগ নিম্নভূমিই ছিল পানির নিচে। তখনও আমাদের সেসব পূর্বপুরুষ বাস করার জন্যে বেছে নিয়েছিলেন লালমাটি এলাকাকেই।

আসলে বাংলা অঞ্চলটাকে কিন্তু তিনদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে পাহাড়। কিন্তু এর মূল অংশটা সমতলভূমি। এই সমতলভূমির প্রধান অংশ সৃষ্টি হয়েছে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিতে। পলিবাহিত এই সমভূমিকে ইংরেজিতে 'বেঙ্গল বেসিন'-ও বলে। এ অঞ্চলের আকৃতি অনেকটা গামলার মতো। গামলায় যেমন ধারগুলো উঁচু হয় আর মাঝখানের জায়গটা থাকে সমতল, তেমনি বাংলারও ধারগুলো অর্থাৎ সীমান্তের এলাকা সব পাহাড়ি কিন্তু ভেতরের জায়গা সব সমতল। অবশ্য মধুপুর ও ভাওয়াল গড় এবং সংলগ্ন কিছু উঁচু এলাকাকে হিসেবের বাইরে রাখলে এ কথা পুরোপুরি খাটে। তবে অন্যসব গামলার সাথে এই গামলার একটু ফারাক আছে। তা হল এক্ষেত্রে দক্ষিণ দিকটায় কোনো পাহাড় নেই অর্থাৎ এদিকটায় দেয়ালের মতো উঁচু কোনো জায়গা নেই। তার বদলে আছে সাগর– বঙ্গপোসাগর।

সাগরঘেঁষা-পাহাড়ঘেরা এই দেশের ভূমি জেগে উঠতে শুরু করেছিল কোটি কোটি বছরের নানা ঘাত-প্রতিঘাত আর জটিল সব ঘটনার ফলশ্রুতিতে। তবে হিমালয়ের জেগে ওঠার ঘটনা এই দেশের সৃষ্টিতে রেখেছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর হিমালয় না থাকলে আমাদের দেশের আবহাওয়াও হতো সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাই সাগরের কূল থেকে জেগে ওঠা বাংলাদেশের ইতিবৃত্ত জানতে হলে আমাদেরকে পেছন ফিরে জানতেই হয় সেই মহাসংঘর্ষের ইতিকথা।

আদিম মানুষ

বর্তমান বাংলাদেশের এলাকায় সাগরের বুক থেকে প্রথম যখন ভেসে উঠল মাটি আর সাগর পিছু হটতে শুরু করল, তখন কিন্তু কোনো জনপ্রাণীর বালাই ছিল না। এরপর কেটে গেছে বহু বছর। বহু লক্ষ বছর। বনজঙ্গলে ভরে উঠেছে মাটি। সেখানে বাস করতে শুরু করেছে বাঘ-গণ্ডার-ভাল্লুক আরও কত যে জন্তু-জানোয়ার! আর খাল-নদীর হাঙ্গর-কুমিরসহ কত যে প্রাণী! এক কথায় ডাঙা এবং জলে সবই ছিল এদের দখলে, এমনই এক বিপদজ্জনক অবস্থায় এদেশে এল মানুষ। তবে তারা যে সখ করে বেড়াতে এসেছিল তা কিন্তু নয়, আসলে এরচেয়েও বড় বিপজ্জনক জায়গা থেকে বাঁচার আশায়, অথবা বসবাসের জায়গা থেকে বেশি আরামের জায়গার খোঁজে যাত্রা করেছিল তারা, আর সেকালের যাত্রা মানেই ছিল নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা। পৃথিবীতে কোনো পথ-ঘাট ছিল না, যন্ত্রপাতিও কিছুই ছিল না মানুষের। এমনকি নৌকা ও জাহাজ বানাতেও কেউ শেখেনি। তাছাড়া পৃথিবীতে তখন চলছিল ভীষণ ঠাণ্ডার এক যুগ। সে যুগকে বলে বরফ যুগ। উত্তরের পৃথিবী ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস আমাদের দেশের উত্তরে ছিল হিমালয়। তাই এর উঁচু পাথুরে দেয়াল থামিয়ে দিয়েছিল সেই মহাঠাণ্ডার ঢেউকে। আমাদের দেশটা কম ঠাণ্ডার দেশ বলে এদেশে মানুষের বসবাসের জন্যে বেশ সুবিধেই ছিল। আর আমরা যে কালের গল্প শুনছি সেকালে মানুষের জীবনটা কোনো দেশেই সুখের ছিল না। তাদের বাস করতে হতো বুনো জন্তু-জানোয়ারের সাথে লড়াই করেই।

সেসব জন্তু মারার জন্যে তাদের উন্নত কোনো অস্ত্রপাতিও ছিল না, এমনকী তীর-ধনুক পর্যন্ত ছিল না। মাটির ঢেলা, পাথরের খণ্ড, এসবই ছিল অস্ত্র। তবে সবচেয়ে মজবুত অস্ত্র বলতে ছিল পাথরের খণ্ডগুলো। তাই সেই যুগকে এখন নাম দেয়া হয়েছে পাথরের যুগ। সে যুগের মানুষ লেখাপড়া শেখার কথা ভাবতেও পারত না। তাই সে সময়ের ইতিহাস জানার জন্যে আমরা তখনকার হাতিয়ারগুলো দেখেই যেটুকু অনুমান করতে পারি। আমাদের দেশে সেই পাথরের যুগেও যে মানুষ বাস করত তার অনেকগুলো প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে পাথরের হাতিয়ার, সেসব হাতিয়ার পরীক্ষা করে এখন অনুমান করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে থেকেই মানুষ বাস করত।

এদেশে প্রথম পাথরের হাতিয়ারটি পাওয়া গিয়েছিল ১৯৫৮ সালে। যেখান থেকে পাওয়া গিয়েছিল সেই জায়গাটি হল রাঙ্গামাটি। বলা যেতে পারে হঠাৎ করেই আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিক তখন রাঙ্গামাটিতে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম ছিল ডাইসন। তিনি খুঁজে পান সেই হাতিয়ারটি। তিনি সেটা সরকারের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। তবে একসময় সেটা হারিয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় হাতিয়ারটি পাওয়া গিয়েছিল ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থেকে। যে গ্রামে এটি পাওয়া গিয়েছিল তার নাম শিলুয়া। গ্রামটা আবার আমজাতহাতা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। যে বছর এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটা ছিল ১৯৬৩ সন, জিনিসটা ছিল চাঁচরি ছাগলনাইয়া থেকে সীতাকুণ্ড খুব বেশি দূরের পথ নয়। তবে সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। সেই সীতাকুণ্ড থেকে কিন্তু একাধিক পাথরে হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৬৮ সনে। বিভিন্ন রকমের পাথরের তৈরি হয়েছিল এসব হাতিয়ার, এর মধ্যে পাথরে পরিণত হওয়া কাঠও ছিল। এমন ধরনের পাথরে পরিণত হওয়া ১২টি হাতিয়ার ১৯৭৭ সালে কুমিল্লার আনন্দ রাজার বাড়িমুড়া নামের জায়গা থেকে পাওয়া গিয়েছিল। কুমিল্লার লালমাই এলাকা থেকে ১৯৮৯ সালে বেশ কিছু হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার দেওরগাছা নামে একটা ইউনিয়ন আছে। সেখানে চাকলা পুঞ্জিনামে একটা জায়গা থেকে ১৯৯৬-৯৭ সালে হাজার খানেকের মতো পাথরের হাতিয়ারের সন্ধান মিলেছে। এসব ছাড়াও খুব মূল্যবান কিছু পাথরের যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার উয়ারি-বটেশ্বর গ্রাম থেকে। এসবের মধ্যে আছে পাথরের তৈরি হাতুড়ি, হাতকুড়াল, কাঁধযুক্ত বাটালি প্রভৃতি। এগুলোর সবই পাথরের তৈরি। কোনো কোনোটার পাথর আসাম এলাকায় পাওয়া যায় বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, সেই এলাকা থেকে পাথরের হাতিয়ার সম্বল করে এখানে সেকালের মানুষেরা এসেছিল, তবে যেখান থেকেই আসুক না কেন পাথরের যুগের মানুষ যে বাংলাদেশে এসেছিল এবং তারা যে এদেশে বাস করত তা আমরা ভালোভাবেই জেনেছি। তবে তারা দেখতে কেমন ছিল? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো কাউকেই খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ পাথরের যুগে বাস করত এমন মানুষ পৃথিবীতে একটিও বেঁচে নেই। তাছাড়া সেকালের মানুষ লেখাপড়া জানত না বলে কোথাও সেসবের বিবরণও তারা লিখে রাখতে পারেনি। তাই বলে মানুষ কিন্তু হালও ছেড়ে দেয়নি, বাংলাদেশের

সেসব আদিম মানুষের খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে বেশ আগে থেকেই, পণ্ডিতরা এসব বিষয় নিয়ে ভেবেছেনও অনেক। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এই সিদ্ধান্তটা নিতেই গোল বেঁধেছে। তার পরেও অনেকেই মনে করেন যে, প্রথম যে সব মানুষ এদেশে এসেছিল তারা ছিল নেগ্রিটো জাতের, এসব মানুষের গায়ের রং ছিল কালো। এরা ছিল বেশ বেঁটে-খাটো। তখনও কৃষির আবিষ্কার হয়নি এবং তারা ছিল পাথর যুগেরই মানুষ। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে গাছের ফল খেত আর পশুর পালের পেছনে ধাওয়া করে তাদেরকে শিকার করত। খুব সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, লাল মাটিযুক্ত বরেন্দ্র এলাকা এবং অন্যকিছু পাহাড়ি এলাকায় এসব মানুষের বসবাস ছিল। নেগ্রিটোদের যে বৈশিষ্ট্য তা কিন্তু আজকের দিনের বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না। তবে কালেভাদ্রে হঠাৎ করেই এমন মানুষ বাঙালিদের মধ্যে কখনও-সখনও যে দেখা যায় না, তাও বলা যায় না। এখন কথা হল, হাজার হাজার বছর আগে যেসব মানুষ বাস করত তাদের চেহারা এতকাল পরের মানুষের মধ্যে খুঁজে কি কোনো লাভ হবে? প্রশ্নটা মনে আসতেই পারে, তবে জবাব কিন্তু কঠিন নয়।

একদল নেগ্রিটো মানুষ

আচ্ছা, আমাদের চেহারার সাথে কি আমাদের মা-বাবার চেহারার মিল নেই? অবশ্যই আছে, শুধু মা-বাবা বলছি কেন, চাচা, মামা, খালা, ফুফু, নানা, নানী, দাদা, দাদি সবার চেহারার ছাপই তো আমাদের চেহরায় দেখা যায়, আসলে আত্মীয়-স্বজন ও পূর্বপুরুষের চেহারা পরবর্তীকালের মানুষের মধ্যে বারবার ফিরে আসে। হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষও ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ। তাই তাদের চেহারা আমাদের সমাজ থেকে যে একেবারেই মিলিয়ে যাবে না তা আমরা বুঝতে পারি। একারণেই এখনকার বাংলাদেশের মানুষের চেহারা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এদেশের মানুষের পূর্বপুরুষের চেহারা কেমন থাকা সম্ভব ছিল।

নেগ্রিটোদের পরে এদেশে যারা এসেছিল তারা ভেদ্দা দলের মানুষ ছিল বলে মনে করা হয়। তবে অনেকেরই ধারণা এই ভেদ্দারাই এদেশের আদি বাসিন্দা। এর কারণ অবশ্য অনেক। একে তো এই দলের মানুষদের মতোই চেহারা এদেশের বেশির ভাগ মানুষের। তাছাড়া বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ যেই ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা অর্থাৎ বাংলার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শব্দ এসেছে তাদের ভাষা থেকে। এসব মানুষ এদেশে হাজার হাজার বছর ধরে বাস করেছে। একসময় এরাই বাংলাদেশে কৃষিকাজের সূচনা করেছিল। ধান-কলা-বেগুন-পান প্রভৃতি ফসলের চাষ এরাই শুরু করেছিল বলে ধারণা হয়। কার্পাস, কাপড়, লাঙল প্রভৃতি শব্দ আমরা তাদের কাছেই পেয়েছি। এদের মাথা ছিল লম্বাটে। নেগ্রিটোদের মতো এরা বেঁটে নয়। তবে গায়ের রং কিন্তু কালোই। সুদূর অতীতকাল থেকেই বাংলাদেশের বনে হাতি পাওয়া যেত, এরা সেই হাতিকে পোষ মানিয়েছিল বলে মনে করা হয়। আজকের দিনের সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল প্রভৃতি জাতের মানুষের চেহারায় আজও সেসব আদ্যিকালের চেহারার ছাপ দেখা যায়।

আজকের দিনে অবশ্য ভেদ্দা মানুষের বসবাসের প্রধান জায়গা হল দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কা। ভেদ্দাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার জন্যে দ্রাবিড়দের চেহারার দিকে দেখলেও চলে। এখানে একটা কথা, আমাদের দেশে বর্তমানে সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর যেসব মানুষ বাস করে তারা কিন্তু খুব বেশিকাল আগে এদেশে আসেনি। মাত্র এক-দেড়শো বছর আগে এদেশের লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল। তখন বহু এলাকাই পড়ে থাকত। কেউ সেখানে শস্যের চাষ করত না, সেই পড়ে থাকা জায়গায় ফসল ফলাবার

জন্যে এই জাতির পরিশ্রমী মানুষদেরকে জমিদাররা এদেশে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এই জাতির মানুষ অতীত কালে হাজার হাজার বছর ধরে এদেশে বাস করত। এক সময় তারা এদেশ থেকে চলে যান বা চলে যেতে বাধ্য হন। কেন তারা চলে গিয়েছিলেন সেই ইতিহাস চিরকালের জন্যে হারিয়ে গিয়েছে। তবে এখানে আরও একটা মজার কথা, চেহারার দিক দিয়ে, যেই সাঁওতালদের সাথে আমাদের এতো মিল তাদের মুখের ভাষার সাথে আমাদের ভাষার অনেক পার্থক্য।

শ্রীলঙ্কার একদল ভেদ্দা মানুষ

পৃথিবীতে যতগুলো ভাষা আছে। সেগুলোর মধ্যে যাদের সাথে যাদের মিল বেশি তাদেরকে একই পরিবারের ভাষা বলে মনে করা হয়। আমাদের ভাই-বোনেরা যেমন একই বাবা-মা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বলে আমরা একই পরিবারের মানুষ, তেমনি একই আদি ভাষা থেকে যেসব ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তারাও একই পরিবারের ভাষা বলে ধরে নেয়া হয়। সাঁওতালদের ভাষা এবং বাঙালিদের ভাষা কিন্তু পুরোপুরি আলাদা পরিবারের ভাষা। তাহলে সাঁওতালদের অস্ট্রিক ভাষা বাঙালিদের ভাষাকে শব্দ দিয়ে এতোটা সাহায্য

একদল ভেদ্দা শিশু

করল কী করে? এর মূল কথা হল, যেহেতু ঐ ভেদ্দারা আমাদের পূর্বপুরুষ ছিল এবং তাদের জীবন ও জীবিকার অর্থাৎ বেঁচে থাকার প্রধান উপায় ছিল কৃষিকাজ তাই সেই আদিকালে কৃষির প্রয়োজনে তারা যেসব শস্যের প্রচলন করেছিল তা হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দেশের মানুষ ব্যবহার করে এসেছে। এখনকার বাঙালিদের ভাষা বাংলা। আর সাঁওতালদের ভাষা সাঁওতালী আলাদা ভাষা হলেও শব্দগুলোর ব্যবহার এখনও আছে।

সেকালে এদেশে কাপড়ের জন্যে কার্পাস তুলার চাষ হতো এবং কার্পাস শব্দটা আদিকাল থেকেই আমাদের দেশে রয়ে গেছে, লাঙল, কুলা, ডোঙা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এদেশের কৃষক আজও করে। এগুলো কিন্তু পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।

ভেদ্দাদের মধ্যে যে ঢেউ খেলানো ও কোকড়ানো চুল দেখা যায় তা আজও বাঙালিদের মধ্যেও দেখা যায়। এদের মতো বাঙালিদেরও লম্বা মাথা। সরল নাকের ও ঢালু কপালের মানুষ এদেশে হরদম চোখে পড়ে। এরা মাঝারি থেকে লম্বা হয়, তবে খুব বেশি খাটোও না আবার খুব বেশি লম্বাও না।

ভেদ্দাদের পরে আরও বহু জাতের মানুষ এদেশে এসেছিল। তারা অবশ্য একসাথে আসেনি। এসেছিল বিভিন্ন সময়ে। আলপিয়ন নামের এক জাতের মানুষ এসেছিল পশ্চিম দিক থেকে। এরা ছিল ফরসা মানুষ। এদের মুখে দাড়িগোঁফ ছিল যথেষ্ট। নাক ছিল খাড়া আর মাথা ছিল গোল। তারপর এসেছিল আর্যরা।

আর্যরা কিন্তু ছিল অনেক দূর দেশের মানুষ। এদের গায়ের রং ছিল ফরসা। মাথাও ছিল লম্বা। নাক ছিল খাড়া। আর চোখের রং ছিল কটা।

হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পশ্চিম দিক থেকে এরা বাংলাদেশে এসেছিল। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর বা তারও কিছু আগে থেকে এরা দলে দলে আসতে শুরু করেছিল বাংলাদেশে। এদেশে আগে থেকে যত মানুষ বাস করত তাদের সবার ওপরেই এদের প্রভাব দিনে দিনে বেড়েছিল। আর ওই যে আর্য নামটা, ওটারও একটা বিশেষ মানে আছে। সেই মানেটা হল– সভ্য। তারা নিজেরাই চালু করেছিল এই নাম। এ নাম দিয়ে তারা বোঝাতে চাইছিল যে, তারাই ছিল সবচেয়ে সভ্য জাতি। কথাটা কিন্তু মোটেও ঠিক ছিল না। আর্যরা আসার আগেই এদেশের মানুষ খুবই উন্নত সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। তবে একটা কথা ঠিক যে, আর্যরা খুবই যোদ্ধা জাতি ছিল। তারা ঘোড়ায় চড়ে দূর দেশে যেত। যুদ্ধও করত ঘোড়ায় চড়ে। তাদের অস্ত্রপাতি ছিল লোহার তৈরি। লোহার বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে যেত তারা। এই জাতির লোকেরা একসময় এদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠল। এদেশে তারা রাজত্বও বিস্তার করল। ফলে অন্য সবাই তাদের শাসনকে মেনে নিল। দিনে দিনে অবস্থা এমন হল যে, তাদের ভাষাই হল রাজভাষা। সরকারি কাজকর্মে শুধুমাত্র তাদের ভাষাই ব্যবহৃত হতে লাগল। ফলে রাজ্যের লোকজন সবাই বাধ্য হয়ে হলেও আর্যভাষা শিখতে শুরু করল। শেষে এমন অবস্থা হল যে, আর্য ভাষাই হয়ে দাঁড়াল এদেশের মানুষের ভাষা। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলাও একটি আর্য ভাষা।

তবে আরও এক জাতের মানুষ বিপুল সংখ্যায় এদেশে বসতি গেড়েছিল। তারা ছিল মঙ্গোলীয়। প্রায় ৩০০০ বছর আগে থেকেই আমাদের দেশে মঙ্গোলীয়দের আগমন শুরু হয়েছিল। তবে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তিব্বতের এক রাজা বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল পর্যন্ত তার রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন। সেই সুবাদে তার দেশের বহু মানুষ বাংলাদেশের উত্তর ভাগে বসতি গেড়েছিল। এখনও পর্যন্ত চীন থেকে শুরু করে আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা ও মিজোরাম হয়ে মিয়ানমার পর্যন্ত যত মানুষ বাস করে তারা সকলেই মঙ্গোলীয় জাতির। তাই এসব মানুষের এদেশে আসা খুব সহজ ছিল। মঙ্গোলীয়দের চেহারাটা এমনই যে, একবার দেখে নিলে খুব সহজেই তাদের চিনে নেয়া যায়। সাধারণত এদের নাক খাঁদা, চোখ ছোট ছোট, চোখের কোণায় থাকে বিশেষ ধরনের ভাঁজ, চোয়ালের হাড় হয় উঁচু, মুখে দাড়ি গোঁফ থাকে সামান্য, চুল হয় সরল অর্থাৎ এদের চুলে কোকড়ানো বা ঢেউ খেলানো ভাব থাকে না। এদের গায়ের রং

হয় হলদেটে ফর্সা, এখনও বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের জায়গাগুলোতে মাঝে মাঝে বাঙালিদের মধ্যে এমন ধরনের চেহারার মানুষের দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ হল, তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ না কেউ মঙ্গোলীয় ছিল, অবশ্য এতে তেমন দোষেরও কিছু নেই। কারণ বাঙালি জাতিতে এসে নেগ্রিটো, ভেদ্দা, আলপিয়ন, আর্য, মঙ্গোলীয় সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপের এক অনুষ্ঠানে এই ছবিটি তোলা হয়েছিল। এতে পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির মানুষ অংশ নিয়েছিল। ছবিটিতে যেসব হরেক রকম মানুষের চেহরা দেখা যাচ্ছে তা লক্ষ্য করার মতো। আমাদের বাঙালি জাতিতে এমন বহু রকমের চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য এসে মিলেমিশে একাকার হয়েছে বাঙালিতে

পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষদেরকে এখন পণ্ডিতরা নয়টি বড় ভাগে ভাগ করেছেন। সেই ভাগের মধ্যে রয়েছে

১। পলিনেশীয় (যেমন, তাহিতি দ্বীপের মানুষ)
২। এশীয় (যেমন, চীনের মানুষ)
৩। আফ্রিকান (যেমন, তাঞ্জানিয়ার মানুষ)
৪। আমেরিকান ইন্ডিয়ান (যেমন, বলিভিয়ার আদিবাসী ইন্ডিয়ান)
৫। মেলানেশীয় (যেমন, নিউগায়ানার মানুষ)
৬। মাইক্রোনেশীয় (যেমন, ইয়াপ দ্বীপের মানুষ)
৭। অস্ট্রেলীয় (যেমন, অস্ট্রেলীয় আদিবাসী)
৮। ইউরোপীয় (যেমন, ইটালির মানুষ)
৯। ভারতীয় (যেমন, শ্রীলঙ্কার মানুষ)

নিচের ছবিগুলোতে পৃথিবীর নয়টি মহাজাতির মানুষের চেহারার বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে, যাদের অনেকের সাথেই বাঙালির চেহারার মিল আছে।

পলিনেশীয় এশীয় আফ্রিকান

আমেরিকান ইন্ডিয়ান মেলানেশীয় মাইক্রোনেশীয়

অস্ট্রেলীয় ইউরোপীয় ভারতীয়

এসব জাতির অনেকগুলোর বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় বাঙালির মধ্যে। তবে সাধারণভাবে বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের দেশসমূহের মানুষকে ফেলা হয়েছে ভারতীয় শ্রেণীতে। এশীয় শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে চীনাদেরকে। এদের সাথে মঙ্গোলীয় উৎসের মানুষের চেহারার মিল সহজেই চোখে পড়ে। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের সাথে আমাদের দেশের আদিবাসী সাঁওতালদের চেহারার মিল লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকা ও ইউরোপীয়দের সাথেও অনেক বাঙালির চেহরার মিল দেখা যায়।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটেছিল আমাদের দেশে। সে বছর বখতিয়ার খলজি নামে এক তুর্কি বীর বাংলাদেশের উত্তর ভাগের এক বিরাট এলাকা দখল করেছিলেন। সেই থেকে এদেশে শুরু হয়েছিল মুসলিম শাসনের। সেই সুবাদে, আরব, তুর্কি, ইরানী, হাবসি, পাঠান, মুঘল প্রভৃতি হরেক জাতের মানুষ এদেশে এসেছে এবং এখানেই থেকে গেছে। ফলে তারাও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বাঙালি জাতিতে, এভাবেই কালের পরিক্রমায় সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি নামের এক নতুন জাতির।

তাই বলে এটি কিন্তু মোটেই ঠিক নয় যে, বাংলাদেশের জাতি বলতে আমরা শুধু বাঙালিকেই বুঝব। আসলে বাঙালি ছাড়াও আরও বহু জাতির মানুষ এদেশে বাস করে। এদেরকে আমরা বলছি আদিবাসী। বাংলাদেশে ৪৫টির মতো আদিবাসী জাতির বাস। এদের বেশির ভাগের চেহারা মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যের। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জেলায় এরা বাস করে।

সংখ্যায় বাঙালিরাই এদেশে বেশি। সংখ্যার দিক দিয়ে অন্যান্য জাতির লোকেরা অল্পই বাস করেন। তাই বলে কোনো জাতিই ছোট নয়, সংখ্যায় ছোট হতে পারে কিন্তু মর্যাদায় তারা সবাই বড়। প্রত্যেকরই আছে নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব ইতিহাস। বাঙালিদের মতো তারাও নিজেদের ভাষায় গান গায়, ছড়া কাটে, কবিতা এবং গল্পের সৃষ্টি করে। বাঙালির কাছে বাংলা যেমন প্রিয় ভাষা, তাদের গেছে নিজেদের মাতৃভাষা অতি প্রিয়।

প্রাচীন যত রাজ্য

বহুকাল আগে বাংলাদেশ নামে কোনো আলাদা দেশ ছিল না। তখনও কিন্তু এখানে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের সংখ্যা যে কত এবং তার সীমারেখা যে কী ছিল তা বলা মুশকিল। হাজার হাজার বছর আগে লেখা বিবরণীতেও এমন কিছু কিছু রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। সেসব রাজ্যের আয়তন কখনও বেড়েছে কখনও কমেছে।

পুণ্ড্র

আজ থেকে দু হাজার আট বছর আগে লেখা হয়েছিল ঐতরেয় আরণ্যক নামে বই। সেখানে পুণ্ড্র নামের উল্লেখ ছিল। পুণ্ড্র একটা জাতির নাম ছিল,
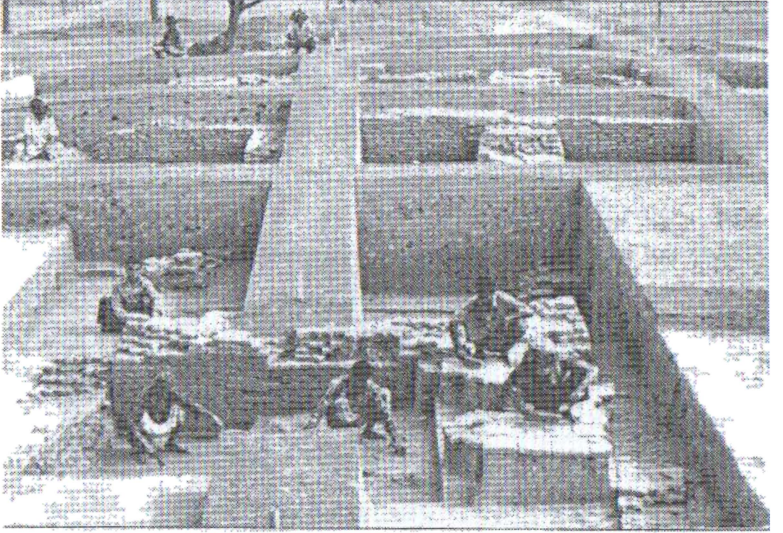
প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ভাসুবিহারে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের ছবি। এখানে মূল্যবান প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে

আর তাদের রাজ্যের নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন এর রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। এই বিবরণ পড়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এ কথা জানার আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল যে, পুণ্ড্রনগর জায়গাটা আসলে কোথায় ছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এ

বিষয়ে অনেক বেশি খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছিল। নানা জনে নানা কথা বলেছিলেন কিন্তু সঠিকভাবে জায়গাটি যে কোথায় ছিল তা কেউ বুঝতে পারছিল না, ১৮৭৯-১৮৮০ সালে বাংলাদেশের বগুড়া শহরের নিকটবর্তী মহাস্থান গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম নামের এক ইংরেজ পণ্ডিত প্রথবারের মতো বলেন যে এই মহাস্থানই ছিল পুণ্ড্রনগর। এরপর কেটে গেল বহুবছর। ১৯৩১ সালে মহাস্থানে হঠাৎ করেই পাওয়া গেল একটা পাথরের ওপর খোদাই করা কিছু লেখা। খুবই প্রাচীনকালের ভাষায় লেখা। সে ভাষায় পৃথিবীতে আর কেউ কথা বলে না। সেই ভাষাকে এখন আমরা বলছি মাগধী প্রাকৃত বা পূর্বদেশের প্রাকৃত। ঐ ভাষা এদেশের মানুষ তখন ভালোই বুঝত আর যেই বর্ণমালা ব্যবহার করে কথাগুলো লেখা হয়েছিল তা হল ব্রাহ্মণী বর্ণমালা। একে ব্রাহ্মীলিপিও বলে। ঐ পাথরের টুকরোই কিন্তু ফেলনা কোনো জিনিস ছিল না, ওটা ছিল ইতিহাসের মস্ত এক দলিল। ১৯৩১ সালে আবিষ্কার হয়েছিল সেই পাথরটি। এমন ধরনের যেসব পাথরখণ্ডের ওপর লেখা খোদাই করা হয় তাদের বলে শিলালেখ। মহাস্থানের সেই শিলালেখটি হল এদেশের সবচেয়ে পুরানো শিলালেখ। মনে করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৩০০ বছর আগে এই শিলালেখটি লেখা হয়েছিল। আর ঐ শিলালেখটিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা লিপি থেকে পরিবর্তনের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে সৃষ্টি হয়েছে বাংলা বর্ণমালা। কাজেই বাংলা বর্ণমালার আদি সূত্র হিসাবেও ঐ শিলালেখটিকে গণ্য করা হয়, সেই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এটি মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরভাগের রাজশাহী বিভাগ জুড়েই পুণ্ড্ররাজ্য অবস্থিত ছিল। তবে এই সীমানা যে সব সময় এমনটি ছিল না তাও ঠিক নয়।

বঙ্গ

বাংলাদেশের মধ্যভাগ জুড়ে ছিল বঙ্গরাজ্য। ২০০০ বছরেরও আগে থেকেই এই নামটার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন যে আমাদের পুরো দেশটার নাম হয়েছে বাংলাদেশ, তাও কিন্তু সেই বঙ্গ থেকেই হয়েছে। বৃহত্তর ঢাকা থেকে শুরু করে ফরিদপুর-বরিশাল হয়ে, খুলনা-যশোর পর্যন্ত এর সীমানা ছিল বলে জানা যায়।

সমতট

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে সমতট নামটি
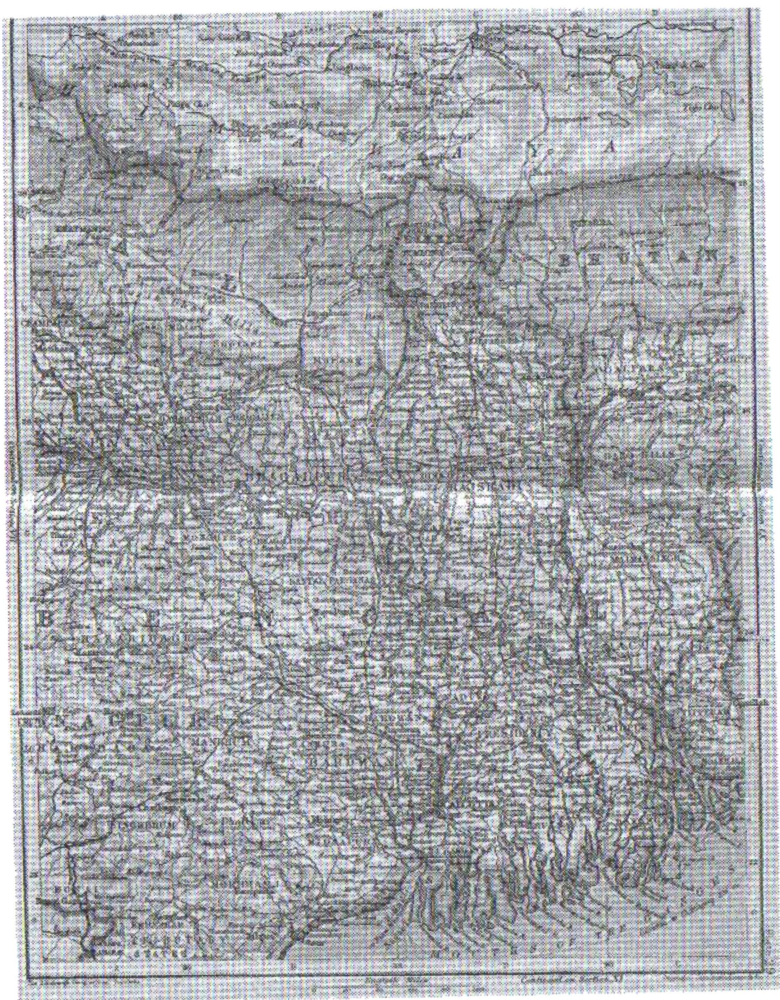
১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলা অঞ্চলের ম্যাপ

প্রথম আলোচনায় আসে। হয়তোবা এরও অনেক আগে থেকে এ নামের চল হয়েছিল। তবে সেসব কথা এখন আমাদের জানা নেই। কুমিল্লা, এমনকী আরও অনেক দূর পর্যন্ত মেঘনার মোহনা থেকে ভাগীরথীর পূর্বতীর পর্যন্ত এক সময় এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সেই হিসেবে বর্তমান যশোর-খুলনা জেলাও সমতটের অংশ ছিল।

চন্দ্রদ্বীপ

প্রায় ১০০০ বছর আগেকার কিছু তামার ফলকের লেখা থেকে চন্দ্রদ্বীপ নামের একটি রাজ্যের কথা জানা যায়, যেটি বরিশাল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হরিকেল

হরিকেল নামের একটা রাজ্যর কথা আজ থেকে ১৩০০ বছর আগে চীন দেশের পর্যটক ইৎসিঙের লেখা থেকে জানা যায়।

নগরের তীরে ছিল সেই রাজ্য। এছাড়াও মায়ানমারে কিছু প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালেখ পড়ে মনে করা যায় যে, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ছিল সেই রাজ্য। কেউ কেউ বলছেন সিলেটে ছিল এই রাজ্য। আবার অনেকে বলছেন, ওই রাজ্য ছিল সিলেট-চট্টগ্রামে।

গৌড়

প্রায় ২৫০০ বছর আগে থেকেই গৌড় রাজ্য গড়ে উঠতে শুরু করে বলে ধারণা করা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের অনেকখানি এলাকা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গৌড় নামে এক সময় মস্ত একটি শহরই গড়ে উঠেছিল। এককালে বাংলাদেশের রাজধানী ছিল সেখানে। এ শহরের শহরতলী অংশটি বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্তে পড়েছে। মূল স্থানটি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার অন্তর্গত। বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষেই শহরটির অবস্থান তোমরা যদি কখনও সোনা মসজিদ এবং দরসবাড়ি মসজিদ দেখতে যাও তাহলে দেখতে পাবে, বাংলাদেশ থেকে পাকা এক সড়ক একটি প্রাচীন তোরণের মধ্য দিয়ে ভারতের ভেতর ঢুকে গেছে। সেই তোরণটি হল গৌড় নগরীর একটি প্রবেশ পথ।

তবে বর্তমানে ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের সুক্ষ্ম ও রাঢ় ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বীরভানপুর, তাম্রলিপ্তি, পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি জায়গা এখন পশ্চিমবঙ্গে। বাঙালির সভ্যতার বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে সেসব জায়গায়।

প্রাচীন শহর

বাংলাদেশ যে একটা অত্যন্ত প্রাচীন সভ্য দেশ সে তো আমরা জানি, কিন্তু এদেশে সবচেয়ে আগে কোন শহরটি গড়ে উঠতে শুরু করেছিল তা কি আমরা জানি? আগে আমরা জানতাম না বটে, কিন্তু এখন আমরা অনেকটাই জানি। ১৯৩১ সালে বগুড়ার মহাস্থানে যে শিলালেখটি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা গেছে যে, আজ থেকে ২৩০০ বছর আগে সেখানে একটি রাজধানী শহর ছিল। এরই সূত্র ধরে সেখানে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। আবিষ্কার হয়েছে হরেক রকমের জিনিসপত্তর। এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন কালের মুদ্রা, বাসন-কোসন, পোড়ামাটির ফলক, অপূর্ব সব চিত্র আঁকা পাথরের খণ্ড, দালানে ব্যবহৃত পাথরের থাম, পোড়ামাটির সিল, ব্রোঞ্জের আয়না, মূর্তি আরও কত কী! সেখানকার জিনিসপত্র নিয়ে দেশে এবং বিদেশে অনেক মাথা খাটিয়েছেন পণ্ডিতেরা। তারপর জানা গিয়েছে আনুমানিক প্রায় ২৪০০ বছর আগে সেখানে দালান গড়েছিল মানুষ। তাই এখানকার শহরটা যে প্রায় ২৪০০ বছরের পুরনো তা বোঝা যায়। তবে এর চেয়েও আগে জনবসতি গড়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া যায় আর একটা জায়গায়। অবশ্য
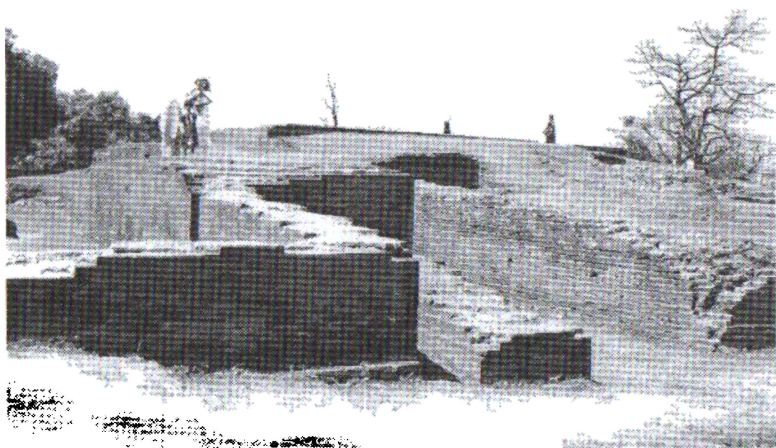
বগুড়ার মহাস্থানের গোবিন্দ ভিটার ধ্বংসাবশেষ

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছিতে সম্ভাব্য গুপ্তযুগীয় শহরের ধ্বংসাবশেষ

সেখানে শহর গড়ে উঠেছিল কি না বলা কঠিন। তবে বড় একটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র যে ছিল তাতে ভুল নেই। জায়গাটা ছিল নরসিংদী জেলার ওয়ারি-বটেশ্বরে। এখানে প্রস্তর যুগেরও অনেক হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া এই বাণিজ্যকেন্দ্রের সাথে সুদূর থাইল্যান্ড এবং রোমান সম্রাজ্যের সাথেও যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে বেশির ভাগেরই নাম-ঠিকানা এখন বিলুপ্ত হয়েছে। এসব শহরের বেশির ভাগই উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল।

পঞ্চনগরী

প্রায় ২০০০ বছর আগে পঞ্চনগরী নামের পরস্পর সংলগ্ন পাঁচটি মস্ত শহর দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। ইউরোপে পর্যন্ত এই নগরীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে সেই শহরটি ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যায় না। অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে এই নিয়ে নানা মত আছে। কেউ বলছেন দিনাজপুরের

চরকাই-বিরামপুর এলাকাতে বিরাট জায়গাজুড়ে গড়ে উঠেছিল শহর পাঁচটি। আবার কারও কারও মতে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার পাথরঘাটায় ছিল পঞ্চনগরী। এখন অবশ্য চরকাই-বিরামপুর এবং পাথরঘাটা দুটো জায়গাতেই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসচিহ্ন পাওয়া গেছে।

পাথরঘাটায় তুলসিগঙ্গা নামে একটা নদী আছে। নদীটা এমনিতে শুকিয়ে খালের মতোই হয়ে যায়, তবে বর্ষা এলে এর দুকূল ছাপিয়ে প্রবল স্রোত বইতে থাকে। তখন মনেই হয় না যে, শীতকালে এটি ছিল একটি শুকনো খাল। পুরো পাথরঘাটা এলাকা জুড়েই অনেকদিন আগে ছড়িয়ে ছিল বহু ঢিবি। বহুকাল আগে প্রতিটি ঢিবিতেই ছিল বিরাট বড় বড় অট্টালিকা। অট্টালিকাগুলো ধ্বংস হবার কয়েকশ বছর পর সেগুলো ভেঙ্গে পড়ে এবং ধীরে ধীরে সেসবের ওপর জমতে থাকে ধুলো-বালি। একসময় এগুলোই পরিণত হয় ঢিবিতে।

পাথরঘাটায় যে খুব বড় শহর ছিল তাতে কোনো সন্দেহই রাখা চলে না। তখন ছিল রাজা-বাদশাদের আমল। তাই সেই শহরে ছিল ছাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া। ছিল মস্ত বড় বড় অট্টালিকা। চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ছিল সেই শহরের দালানকোঠার। উঁচু উঁচু সেসব দালান দূর-দূরান্তের মানুষও দেখতে পেত। তবে কাছে এসে যে দেখত সে মুগ্ধ না হয়ে

পাথরঘাটার প্রাচীন নগরীর ইমারতে ব্যবহৃত একটি স্তম্ভ

থাকতে পারত না। এ কথা শুনে হয়তো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, শহরটা যে সত্যিই অমন সুন্দর ছিল তা আমরা বুঝলাম কী করে? তা তো বটেই। কারণ এতকাল পরে সেকালের শহরের কথা জানা তো আর সোজা ব্যাপার নয়। তবে একটা কথা। মানুষ চিরকাল বেঁচে না থাকলেও তার কীর্তি তো বেঁচে থাকে। যেমন সেই প্রস্তর যুগের মানুষ আজ পর্যন্ত বেঁচে নেই। কিন্তু তাদের ব্যবহার করা হাতিয়ার দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে, সেসব মানুষ একসময় সত্যি সত্যিই বাস করত। তেমনিভাবে পাথরঘাটাতেও সেকালের মানুষের ব্যবহার করা বহু জিনিসপত্র ও তাদের তৈরি করা দালানকোঠার বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। তবে খুবই দুঃখের বিষয়, না বুঝে সাধারণ মানুষ প্রাচীনকালের দালানকোঠা ভেঙে সেখান থেকে ইট-পাথর নিয়ে গেছে। সেখানকার প্রাচীন ঢিবি ধ্বংস করে সেই জায়গায় নতুন পাকা দালান বানিয়েছে। এসব না করলে প্রাচীন এই শহরের পুরোটাটাই আমরা দেখতে পেতাম। শুধু তাই নয় গোটা দুনিয়ার মানুষই তা দেখে অবাক হতো এবং বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার কথা গোটা দুনিয়ার মানুষই জানতে পারত। কিন্তু তারপরেও এখনও যা আছে তা'ও অবাক করার মতো। এখনও এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে অনেক পাথরের খণ্ড। এমনকি খুবই সুন্দর করে কারুকাজ করা মানুষের মূর্তি খোদাই করা পাথরের খণ্ড, বাঘের মুখ খোদাই করা পাথরের খণ্ড আরও কত কী? আর তুলসীগঙ্গার জলে পড়ে আছে অগণিত পাথর। শীতকালে নদী শুকিয়ে গেলে আজও দেখা যায় শুধু পাথর আর পাথর। ডাঙ্গায় যেসব পাথর ছড়িয়ে আছে সেগুলো ওই প্রাচীন শহরের দালানে ব্যবহৃত হয়েছিল। মূর্তি আঁকা আর কারুকার্যময় পাথরগুলো সেকালের দালানোর গায়ে লাগানো থাকতো। কোনো কোনোটা আবার ছিল ভেঙ্গে পড়া স্তম্ভ বা থাম (খাম্বা)। হাজার হাজার বছর পর সেসব দালানকোঠা পুরোপুরি বিলীন হয়ে গেলেও থামগুলো ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ওসব দেখেই বোঝা যায় যে, কী রকম সুন্দর ছিল দালানগুলো। তখনকার মানুষের কাছে সত্যিই সেটা ছিল এক আশ্চর্য শহর। এতকাল পরে আমরাই কী কম আশ্চর্য হই সে শহরের দালানকোঠা এবং মূর্তির নমুনা দেখে? এখান থেকে আবিষ্কৃত মূর্তি ঢাকার জাতীয় জাদুঘর ও দিনাজপুর জাদুঘরে আছে। জাতীয় জাদুঘরে পাথরঘাটা থেকে প্রাপ্ত একটা পাথরের মূর্তির বয়স প্রায় দু'হাজার বছর। তার মানে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ওই শহরের মানুষ অমন সুন্দর

মূর্তি গড়েছিল। তবে ওটাই শুধু নয়, প্রায় দুই হাজার তিনশ বছরের পুরোনো পাত্রের টুকরোও এখানে পাওয়া গেছে। সেকালের মানুষ এসব পাত্র ব্যবহার করত। তার মানে, সেই প্রাচীন শহর প্রায় দু'হাজার তিনশ বছর আগেও টিকে ছিল। এ এক মহাআশ্চর্য হবার মতো কথাই বটে। তবে ওই যে নদীর জলে পড়ে থাকা পাথরগুলোর কথা বলছিলাম, সেগুলো কিন্তু কোনো দালানে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহার হয়েছিল একটা সেতু তৈরিতে। যে সে সেতু নয়, একেবারে পাথরের সেতু। কম করে হলেও দেড় হাজার বছর আগে বানানো হয়েছিল সেই সেতু। অমন সেতু এদেশে কিন্তু প্রাচীনকালে আর একটিও বানানো হয়নি। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের অন্তর্গত পশ্চিবঙ্গেও কোথাও এমন প্রচীন পাথরের সেতু পাওয়া যায়নি। তুলসীগঙ্গা নদীর পাড় ঘেঁসে মাটির গভীরে এখনও সেতুটার ইটের খিলান দেখা যায়। সেতুটা এখন ভেঙ্গে পড়ে তার পাথরগুলো ছড়িয়ে পড়েছে নদীর জলে। এই সেতুটা প্রমাণ করছে যে, শহরটা সেখানে খুবই উন্নত ছিল। সেখানে লোক গমগম করত এবং সব সময় নদী পারাপারের দরকার হতো। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, শহরটা নদীর দু'পাশেই ছড়িয়ে ছিল। অথবা দু'পাশে ছিল দুটো আলাদা শহর।

তবে পাথরঘাটা এলাকায় পাঁচটি শহরের ধ্বংসাবশেষ সেভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু দিনাজপুর জেলার চরকাই-বিরামপুরে খুব কাছাকাছি এবং প্রায় লেগে থাকা পাঁচটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেজন্যে মনে হয়– পঞ্চনগরী বোধ হয় চরকাই-বিরামপুর এলাকাতেই ছিল। তাছাড়া পঞ্চনগরী যেহেতু দিনাজপুর এলাকাতে ছিল, আর পাথরঘাটা বৃহত্তর বগুড়া (এখনকার জয়পুরহাট) জেলায় অবস্থিত, তাই পঞ্চনগরী চরকাই-বিরামপুর এলাকায় ছিল বলে অনেকে মনে করেন। তবে এখনও একেবারে নিশ্চিত হয়ে এ ব্যাপারে কোনো কিছু বলা কঠিন। অবশ্য পঞ্চনগরী যে খুবই নামকরা পাঁচটি শহর ছিল সে বিষয়ে সবাই একমত। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেও এই শহরের নামডাক ছিল। সেকালের তামার পাতে খোদাই করা লিপি থেকে এসব করা জানা আছে।

পাল্ল

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলায় পল্লরাজ নামে একটা জায়গা ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত সেখানে কতগুলো ঢিবি ঢাকা ছিল ঘন জঙ্গলের আড়ালে।

একসময় খ্রিস্টধর্ম প্রচারগণ সেখানে গিয়ে প্রচার কেন্দ্র বা মিশন হাউস বানায়। দিনে দিনে জায়গাটায় লোকসমাগম বাড়ে। এখন সেটা প্রায় শহরের মতোই উন্নত হয়ে গেছে। এই পল্লরাজেও কিন্তু এককালে মস্ত একটা শহর ছিল। সবকিছু দেখেশুনে মনে হয় যে, সেখানে আজ থেকে প্রায় এগারো-বারো শ বছর আগে শহর গড়ে উঠেছিল। সে সময় আমাদের দেশে রাজত্ব করত পাল বংশের রাজারা। এঁরা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সেকালে আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্মের খুব কদর ছিল। এ দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ বৌদ্ধ ছিলেন। তো এই পল্লরাজের নিকটবর্তী কুচেরপাড়া গ্রামের প্রাচীন ঢিবিতে ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসের ৯ তারিখেও প্রাচীন দেয়ালের ভাঙা অংশ দেখা গেছে। এই দেয়াল যে, প্রাচীনকালের দালানের অংশ ছিল তা বেশ বোঝা যায়। ২০০৭ সালের ৯ নভেম্বর তারিখে কুচেরপাড়ার নিকটবর্তী গ্রাম পাল্ল'তে প্রাচীন কালের পাকা সড়ক, প্রাচীন দিঘি ও পুরনো আমলের দালানকোঠার ভাঙা অংশ আমি দেখেছি। এখনও ওই এলাকায় যদি তোমরা কেউ যাও তবে দেখতে পাবে চারদিকে ছড়িয়ে আছে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা বড় বড় সব প্রাচীন ইট আর মাটির হাঁড়ি-পাতিলের টুকরো। সেকালের মানুষ কিন্তু আজকের মতো এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিলে রান্না করত না। কারণ অমন জিনিসের কথা তখনকার মানুষের জানাই ছিল না। তাই ওখানে ওসব মাটির পাত্র শহর থাকার খুব বড় প্রমাণ।

কুন্দারণপুর

পাল্ল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে চোরগাছা, কুন্দারণপুর, ছয়ঘট্টি পাঠশাঁও প্রভৃতি গ্রামজুড়ে এক বিলুপ্ত শহরের নিদর্শন ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর তারিখে আবিষ্কারের সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন এ শহরের কেন্দ্র কুন্দারণপুরে ছিল বলে মনে হয়।

বাগদা-বিরাট

দিনাজপুরে ঘোড়াঘাট উপজেলাটা এমন এক জায়গায় অবস্থিত যেখানে এসে মিলেছে কয়েকটা জেলা। একদিকে জয়পুরহাট, অন্যদিকে গাইবান্ধা, আর এক দিকে রংপুর। মজার ব্যাপার আরও আছে। ঘোড়াঘাটের সাথে সংলগ্ন যেসব উপজেলা আছে তা দিনাজপুরেরই হোক, আর রংপুর, গাইবান্ধা বা জয়পুরহাট জেলারই হোক সেসব উপজেলায়ও ছড়িয়ে আছে প্রাচীন যুগের অমূল্য সব নিদর্শন।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সীমানা ঘেঁষেই ঘোড়াঘাট পৌর এলাকা, মানে বর্তমান শহরের সীমানা। এই গোবিন্দগঞ্জের বাগদা এলাকায় মস্ত বড় আখের খামার গড়ে উঠেছে। মহিমাগঞ্জ চিনিকলের জন্যে আখ চাষ করার উদ্যোগ প্রথমে নিয়েছিল সরকার। সেই ১৯৫৮-১৯৫৯ সালের কথা। এ এলাকাটা ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গলে বাঘ থাকত। বিষধর সাপে ভরা ছিল সেই জঙ্গল। তাই মানুষ সেখানে পারতপক্ষে যেত না। একসময় বন সাফ হল। মানুষের আগমনও হল। ওই বাগদা এবং সাহেবগঞ্জ পাশাপাশি এলাকা। এখানে ছিল অনেক প্রাচীন পাকা সড়ক। সেই সড়কের দুধারে সারি সারি মস্ত মস্ত প্রাচীন ঢিবি। সেসব ঢিবিতে ছিল প্রাচীনকালের ইট, পাথর আর দালানের দেয়াল। এসব ঢিবিতে যে প্রাচীনকালে ইমারত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার মানে পাকা সড়কের দুধারে সারি বেঁধে দালান বানিয়েছিল সেকালের মানুষ। শুধু তাই নয়, পাকা সড়কের পাশ দিয়ে মাটির নিচে নির্মাণ করা হয়েছিল পাকা নর্দমা। বাংলাদেশে আর কোনো প্রাচীন শহরের মাটির নিচ দিয়ে পাকা নর্দমা বানানোর কথা জানা যায় না। বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা চার হাজার বছরেরও বেশিকাল আগে অমন নর্দমা বানিয়েছিল। গোটা পৃথিবীতেই মাটির নিচ দিয়ে পাকা সড়কের পাশ দিয়ে প্রাচীনকালে বানানো অমন নর্দমা প্রায় দেখাই যায় না। সুতরাং এখানকার শহর এবং সেই শহরের উন্নত সব ব্যবস্থা ছিল রীতিমতো চমকে দেয়ার মতো। তবে খুবই দুঃখের কথা, তখনকার সরকারি কর্মকর্তারা নির্দেশ দিয়ে ওই প্রাচীন শহর ধ্বংস করে তা মাটির সাথে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। এখনও সে শহরের মানুষের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা অনেক প্রাচীন দিঘি টিকে আছে। কোনো কোনোটা শুকিয়ে গেছে। তবে পুরো এলাকা জুড়েই ছড়িয়ে আছে বড় বড় দানার মতো ইটের টুকরো, প্রাচীন হাঁড়ি-পাতিলের ভাঙা অংশ। আর একটা মাত্র বড় ঢিবি আছে। ঢিবিটা এখনও মস্ত বড় এবং পাহাড় সমান উঁচু। এখানে যে প্রাচীনকালে পাকা দালান ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এখনও সেই দালানের খানিকটা অংশ ও বড় বড় ইট দেখা যায়। এই প্রাচীন শহরের দালানের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলকে আঁকা ছবি অনেক ছিল বলেই মনে হয়। তবে এখানকার পাথরের খণ্ড, মূর্তি এসব হরেকরকমের সামগ্রী দেখেছেন এমন দু'একজন বয়স্ক মানুষের সাথে কথা বলে যতটা জেনেছি তাতে মনে হয়েছে, প্রায় দেড় হাজার বছর এমনকী তার চেয়েও আগে

এখানে প্রায় ২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিরাট ও উন্নত এক শহর গড়ে উঠেছিল।

এই গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাতেই বিরাট নামের একটা প্রাচীন স্থান আছে। তোমরা যদি কেউ সেখানে যাও তাহলে দেখবে প্রাচীন ঢিবি। সেসব ঢিবির মধ্যে আবার দালানকোঠার চিহ্নও দেখা যায়। এখান থেকে প্রায় এক হাজার বছরের প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। এসব মূর্তির কোনো কোনোটা দিনাজপুর জাদুঘরে আছে। নিশ্চয়ই এই বিরাট এলাকাতেও প্রাচীন শহর ছিল এবং তা হাজার বছরেরও বেশিকাল আগের। আজও এ এলাকার বাড়িঘরের মাটির দেয়ালে লেগে থাকতে দেখা যায় প্রাচীনকালের মাটির পাত্রের টুকরো। প্রাচীন ইটও অনেক পাওয়া যায়। দালানে ব্যবহৃত পাথরের খণ্ডও এখান থেকে অনেক পাওয়া গেছে।

ঘোড়াঘাট

আজকের দিনের ঘোড়াঘাট যে প্রাচীনকালের একটা বড় শহরের ধ্বংসাবশেষের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও কিন্তু খুবই সত্যি কথা। সমস্ত
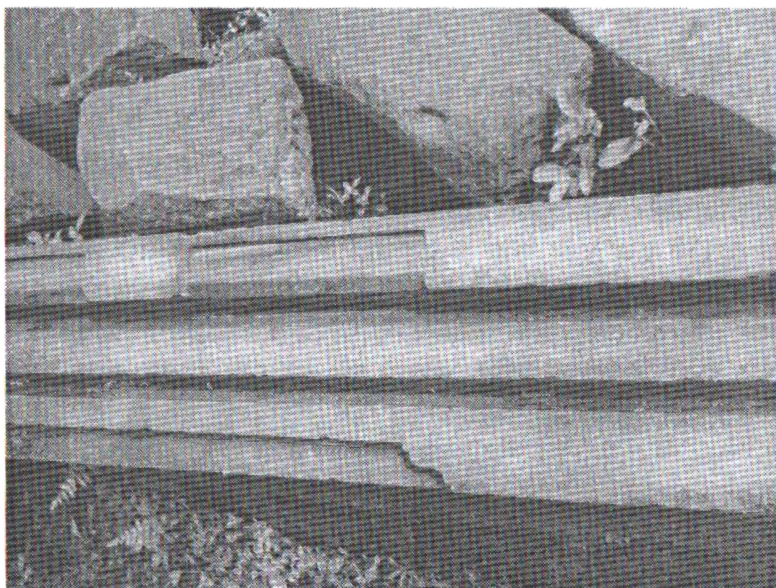
দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে সম্ভাব্য গুপ্তযুগে বানানো ইমারতে এসব পাথর ব্যবহার হয়েছিল

ঘোড়াঘাট জুড়ে ছড়িয়ে আছে প্রাচীনকালের ইট, পাথর আর পোড়ামাটির পাত্রের টুকরো। প্রাচীনকালে এটা একটা মস্ত শহর ছিল এবং সেই শহরের নিরাপত্তার জন্যে এর চারদিক দিয়ে খোঁড়া হয়েছিল খাল, যাতে বাইরের শত্রুরা সহজে হামলা চালাতে না পারে সেখানে। সে খাল এখনও নদীর মতোই গভীর। বারো মাস সেই খালে পানি থাকে। এর পাড়ও উঁচু বাঁধের মতোই।

ঘোড়াঘাটে এখন যেসব প্রাচীন কবর, দালানকোঠা, মসজিদ, দেখা যায়, সেগুলোর প্রায় সবই মুঘল যুগের। তবে এসব দালানকোঠায় যেসব পাথর খণ্ড ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলো আরও বহুকাল আগেকার ধ্বংস হয়ে যাওয়া দালানে ব্যবহার হয়েছিল। সেসব দালান কম করে হলেও দেড় হাজার বছর আগে বানানো হয়েছিল। পীর সদর উদ্দিনের বাড়ি নামের ঢিবির প্রবেশ পথের তোরণ এবং পীর সদর উদ্দিনের মাজার ও মসজিদ এলাকায় এমন পাথরের অনেক বিশাল বিশাল ওজনদার খণ্ড পড়ে আছে। ঘোড়াঘাটে আরেকটা বিখ্যাত জায়গা আছে, দরিয়া বোখারির মাজার। সেই মাজার এলাকায় বিশাল সব পাথরের ছড়াছড়ি। এসবই ওই প্রাচীনকালের দালানে ব্যবহার করা হয়েছিল। দালানগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় পাথরগুলো ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। ঘোড়াঘাট শহর থেকে দিনাজপুরে যাবার পথে এবং ঘোড়াঘাটের খুব কাছেই সুরা মসজিদ নামের একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে একটা। এই মসজিদের নির্মাণে যেসব পাথর ব্যবহার হয়েছিল সেগুলোও প্রাচীনকালের ইমারতে আগে ব্যবহার হয়েছিল। তাছাড়া সেকালের অনেক পাথরখণ্ডই ছড়িয়ে আছে মসজিদের কাছাকাছি জায়গায়।

বারপাইকের গড় ও টংগী

ঘোড়াঘাট উপজেলার বারপাইকের গড় নামের প্রাচীন দুর্গটিও হাজার বছরের অনেক আগে তৈরি হয়েছিল। এ এলাকায় যে শহর ছিল তার প্রমাণ নিজেই দেখেছি। এখানকার প্রাচীন দালান থেকে ইট খুলে নিয়ে আজকাল বহু মানুষ মাটির গাঁথুনি দিয়ে পাকা দালান বানিয়েছে। এই দালানগুলো দেখলেই বোঝা যায় এ এলাকায় কত যে প্রাচীন ঢিবি ছিল। মানুষ সেগুলো ধ্বংস করে দেশের কত বড় সম্পদই না নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

বারপাইকের গড় থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে করতোয়ার তীরে

টংগী নামের গ্রামে একটা বড় ঢিবি আছে। এটি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার সীমানা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে। যেভাবে এই ঢিবির ক্ষতি করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় এককালে এখানে আরও যেসব প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল, সেগুলোরও ক্ষতি এভাবেই হয়েছে। এখন এখানে একটাই ঢিবি আছে এবং তা বিরাট বড়। এ ঢিবিটার খবর কাকতালীয়ভাবেই চেয়েছিলাম এবং তা দেখে অবাক হয়েছি। তবে দেখতে যাওয়ার আগে কোনো বইপুস্তকে এই ঢিবির কথা দেখিনি। এখানে প্রাচীন দালানের নিদর্শন হিসেবে দেয়ালের চিহ্ন আছে। ছড়ানো প্রাচীন ইট অনেক আছে। তবে যা সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে আমার কাছে মনে হয়েছে তা হল, মস্ত একটা পাথরের খণ্ড। নিশ্চয়ই এটা প্রাচীনকালের দালানে ব্যবহার হয়েছিল তবে এটি আগে থেকে এখানে ছিল না। বারপাইকের গড়ের উঁচু ঢিবিতে এটি আগে ছিল। সেই ঢিবিতে একটা মাজার আছে এবং সেই মাজারটি ঢিবির একেবারে ওপরের অংশে। মাজারের বেশ খানিকটা নিচে বৃষ্টিতে ধুয়ে মাটি সরে যাওয়ায় প্রাচীন দেয়ালের খানিকটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। সে দেয়াল যে হাজার বছরেরও অনেক আগকোর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই জায়গাটাতেই নাকি ছিল ওই পাথরখণ্ডটা।

টংগী ঢিবির ওপরে এখন পাকা দালান তৈরি করা হয়েছে। এতে এখানকার প্রাচীন ইমারতের খুবই ক্ষতি হয়েছে। এই টংগী গ্রামেও এক থেকে দেড় হাজার বছর আগে যে একটি শহর-জনপদ ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

উদয়পুরের প্রাচীন শহর

টংগী থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটারের মতো দূরত্বে কাটাদুয়ার। এখানে পরবর্তীতে মাজার-মসজিদ হয়েছে, তবে হাজার বছরেরও বেশিকাল আগে এখানে একটি দুর্গ ছিল। সেই দুর্গের প্রাচীন প্রাচীরের চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

এই পীরগঞ্জ উপজেলার বাগদুয়ার ও পার্শ্ববর্তী মিঠাপুকুর উপজেলার উদয়পুরে প্রাচীনকালে গড়ে উঠেছিল মহানগর। একসময় কালের ধুলোয় ঢাকা পড়েছিল সেই মহানগর। ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের ওপরে শঠিবাড়ি নামের একটা জায়গা আছে। সেখান থেকে একটা পাকা সড়ক চলে গেছে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে। এই সড়ক ধরে ভেণ্ডাবাড়িতেও যাওয়া

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার উদয়পুরে প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ

যায়। শঠিবাড়ি থেকে সেই পথে কয়েক কিলোমিটার এগোলেই ধাপ উদয়পুর গ্রাম। এই গ্রামে এককালে অসংখ্য ঢিবি ছিল। ছিল বহু প্রাচীন দিঘি। এ গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর সময় এমন লোকের দেখাও পেয়েছি যিনি নিজে চোখে প্রায় আড়াইশো ঢিবি দেখেছেন। বর্তমানকালের পাকা সড়কটা আগে ছিল কাঁচা সড়ক এবং এই সড়কের দু'পাশে ছিল সারবাঁধা ঢিবি। প্রতিটি ঢিবিতেই প্রাচীন ইমারতের চিহ্ন দেখা যেত। তবে সেসব ঢিবির কোনোটাই মানুষের নিষ্ঠুর হাত থেকে রেহাই পায়নি। তারা নির্বিচারে হামলা চালিয়েছে ঢিবিগুলোর ওপরে। খুলে নিয়ে গেছে সেখান থেকে ইট। সেসব ইট দিয়ে তারা দালানকোঠা বানিয়েছে। শুধু এই গ্রাম নয়, আশপাশের গ্রামগুলোর মানুষও একই কাজ করেছে। এই গ্রামের এমন একটা বাড়িও পাওয়া যাবে না, যে বাড়িতে এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে কোনো ইট নেওয়া হয়নি। এভাবেই ধ্বংস করা হয়েছে এখানকার প্রাচীন শহর। সেই শহরের পাকা সড়ক, দালানে ব্যবহৃত পাথরের খণ্ড, ইট, দেয়াল এসবের সামান্য অংশই এখনও টিকে আছে।

ফুলবাড়ির প্রাচীন শহর

দিনাজপুরের ফুলবাড়ি ও পার্বতীপুর উপজেলার অনেকগুলো প্রাচীন শহর ছিল। এর মধ্যে একটার নাম পাঁচপুকুরিয়া। জায়গাটা রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার নিকটবর্তী। এখানে এমন প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ বড় ঢিবি ও কয়েকটি প্রাচীন পুকুর টিকে আছে। পার্বতীপুর উপজেলার খোলাহাটিতে যে প্রাচীন শহর ছিল তা এক হাজার বছরের চেয়েও পুরনো ছিল। বদরগঞ্জের চৌধুরীডাঙ্গায় ছিল প্রাচীন এক শহর। সেখানকার দালানকোঠার ধ্বংস চিহ্ন এবং মানুষের ব্যবহার করা জিনিসপত্র অনেকই পাওয়া গেছে।

ফুলবাড়ি উপজেলায় পুকুরি নামের একটা জায়গা আছে। সেখানে এখনও অনেক ঢিবি এবং প্রাচীন দিঘি আছে। এখান থেকে বহু মূর্তি, পাথরের খণ্ড ও প্রাচীন ইট পাওয়া গেছে। কম করে হলেও হাজার– বারো শ বছর আগে এখানে বিশাল শহর ছিল। এখানকার আশপাশের এলাকা থেকেও অনেক প্রাচীন কীর্তি পাওয়া গেছে।

নওয়াবগঞ্জ-বিরামপুর

দিনাজপুরের নওয়াবগঞ্জ ও বিরামপুর উপজেলায় প্রাচীনকালে বহু বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল। ঠাকুরগাঁর রানী শংকইল উপজেলার নেকমরদে প্রায় দেড় হাজার বছরেও প্রাচীন শহর ছিল। সে সবই এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে সেই শহরের মানুষদের তৈরি করা দালানকোঠার ধ্বংসচিহ্ন ও পাথরের তৈরি মূর্তি পাওয়া গেছে অনেক।

পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ের বিশাল প্রাচীন দুর্গ, নীলফামারীর ময়নামতির কোট নামের দুর্গ এসবও মনে করিয়ে দেয় যে, এসবের কাছাকাছি এলাকায় প্রাচীনকালে শহর থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

মাহীসন্তোষ-জগদল

নওগাঁর মাহীসন্তোষ, জগদল, শীতলমঠ, কুসুম্বা, বাঘা প্রভৃতি স্থানেও উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সিরাজগঞ্জ জেলার, রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছীতে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এক মহানগর গড়ে উঠেছিল। এখান থেকে বহু ইট, পাথরখণ্ড ও পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে।

বারোবাজার

ঝিনাইদহের বারোবাজারে যে, হাজার বছরেরও অনেক আগে শহর গড়ে উঠেছিল তাতে কোনো ভুল নেই। সেই শহরের দালানে ব্যবহৃত পাথরখণ্ড আজও দেখা যায়। তবে এখানে মুসলিম শাসনের প্রথম দিককার প্রাদেশিক রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখন আবিষ্কৃত হয়েছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারের প্রাচীন শহরের সুলতানি যুগের নুনগোলা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ

ভাতভিটা

মাগুরা জেলার ভাতভিটায় এবং পুরো টিলা গ্রাম জুড়েই যে একটি বড় শহর গড়ে উঠেছিল দেড় হাজার বছরেরও আগে সে কথা ইদানিং জানা যাচ্ছে। তবে এখান থেকে দু'হাজার বছরেরও বেশি আগে ব্যবহার হতো এমন কিছু মাটির পাত্র পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে খুবই প্রাচীন ইটের দালানকোঠার ভাঙা অংশ। তাই বারোবাজারের চেয়েও এটি প্রাচীন এলাকা বলেই মনে হয়। অবশ্য বারোবাজারেও যে কত দিঘি আছে, সে আর বলব কী! সেই

দিঘিগুলোর প্রায় সবই কম করে হলেও হাজার বছর আগে খোঁড়া হয়েছিল। সেকালের শহরের মানুষ ওসব দিঘির পানিই ব্যবহার করত।

গৌড়

প্রাচীন বাংলায় গৌড় নামের খুব বিখ্যাত এক শহর ছিল। শহরটার আসল খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সুলতানি যুগে। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল সুলতানি যুগ। বাংলাদেশের তখনকার রাজাদেরকে বলা হতো সুলতান। ওটাই ছিল তাদের পদবি। তাই সেই যুগকে বলে সুলতানি যুগ। সে যুগেই চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে পুরো বাংলা একটামাত্র স্বাধীন দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। টানা দু'শো বছরের সেই স্বাধীন যুগে বাংলাভাষা এবং বাংলা সাহিত্যেরও খুব উন্নতি হয়েছিল। সেকালের বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের এক ধনী দেশ। এদেশের কোনো কোনো সুলতান আরব দেশের অভাবী মানুষকে সাহায্য করতেন। মক্কায় হাজিদের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্যেও চেষ্টা করতেন। একবার এক সুলতান তো ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সারা দুনিয়াতে তখন বাংলাদেশের মানমর্যাদা ছিল অন্যরকম। ওই সুলতানি যুগে স্বাধীন বাংলার রাজধানী কয়েকবার বদল হয়েছিল। তখনকার রাজধানী শহর হিসেবে গৌড় ছিল খুব নামকরা। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন রাজদরবার থেকে দূতরা এবং নানা দেশের ভ্রমণকারী মানুষেরা এই শহরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে আসত। তারা শহরের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতো। শহরের পাকা সড়ক, দুধারে ইমারত-অট্টালিকা, গাছ-গাছালি সবকিছু দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে যেত। নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে শহরের গুণগান করে নানা কথা তারা বলত। সে সময়ে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে (এখানকার বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান) দু'টো শহর ছিল সবচেয়ে সেরা। এর মধ্যে একটা ছিল দিল্লি। অন্যটা গৌড়। শুধুমাত্র দিল্লির সাথেই তুলনা চলত গৌড়ের। সেই গৌড় নগরীর বেশিরভাগই এখন পড়েছে ভারতে। তবে বাংলাদেশেও এর খানিকটা অংশ পড়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদের নাম তো সবাই জানে। সেই সোনা মসজিদও কিন্তু গৌড়ের শহরতলীতেই ছিল। এটাও সুলতানি যুগের এক চমৎকার কীর্তি। এককালে এই মসজিদের দেয়ালের ওপর সোনালি রঙের প্রলেপ ছিল বলে জানা যায়। আর সেই সোনালি রঙের জন্যেই এর নাম সোনা মসজিদ হয়েছে বলে মনে করা হয়।

১৮৭৯-১৮৮০ সালে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম নামের যে ইংরেজ পণ্ডিত এখানে এসেছিলেন, তিনিও এ মসজিদের দেয়ালের সোনালি প্রলেপের কিছুটা দেখেছিলেন বলে আমরা জানি। তো যাই হোক, আরও বহু মসজিদ এখানে ছিল। ছিল মস্ত বড় বড় দিঘি। এমনকি পাকা সেতু পর্যন্ত। তবে গৌড়ের বাংলাদেশ অংশে খুবই কারুকার্যময় ও চমৎকার একটি মসজিদ পাওয়া গেছে। তার নাম দরসবাড়ি মসজিদ। অমন জাঁকজমকপূর্ণ প্রাচীন মসজিদ এদেশে বলতে গেলে পাওয়াই যায় না। ইট-পাথরের ওপর কী সাংঘাতিক কারুকাজ। কী আকাশ ছোঁয়া উঁচু দেয়াল। এক মহারাজকীয় ব্যাপার। মসজিদের সামনেই দিঘি। আর দিঘির উল্টোপাশে পাওয়া গেছে একটা মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ। অত প্রাচীন মাদ্রাসার পুরো কাঠামো এদেশে আর পাওয়া যায়নি। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের সাথে এই মাদ্রাসার খুব মিল। একই রকমের ছোট ছোট ঘরে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। মাদ্রাসার ভেতরেও একই রকমের উঠোন। তার মানে সুলতানি যুগের গৌড়ে রাস্তাঘাট যেমন ছিল, তেমনি ছিল বড় বড় অট্টালিকা আর অনেক মসজিদ। পরবর্তী মুঘল আমলেও এখানে তহখানার ইমারত নির্মিত হয়েছে। সেগুলোও দেখার মতো জিনিস। তবে গৌড়ের যে অংশটা আমরা বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে দেখতে পাই, সেখানে যতগুলো মসজিদ এখনও টিকে আছে বা মেরামত করে ব্যবহারের উপযোগী রাখা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেছে। সেগুলোর ভেঙ্গে পড়া অংশ ও পাথর-ইট এসব দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, অগণন মসজিদেরই শহর ছিল সেটা। আর অতগুলো মসজিদ যখন ছিল, তখন সেই শহরে লোক ছিল কত? কারণ মসজিদ তো লোকদের নামাজ পড়ার জন্যেই বানানো হয়েছিল। লোক না থাকলে মসজিদ দিয়ে কী হবে? তাই এতগুলো মসজিদ দেখেও বোঝা যায় যে, লাখো মানুষের শহর ছিল সেটা।

একই রকম মসজিদের শহর এদেশে আরও অন্তত তিনটি ছিল। সব মিলিয়ে চারটি মসজিদের শহরের দেখা জানা যায়। গৌড়সহ সেই চারটি মসজিদের শহরের নাম–

১. গৌড়
২ বারোবাজার
৩. খলিফতাবাদ
৪. ঢাকা

গৌড়, বারোবাজার ও খলিফতাবাদ ছিল সুলতানি যুগের শহর। আর ঢাকায় সুলতানি যুগের মসজিদ আছে। সেটির নাম বিনত বিবির মসজিদ। বাদবাকি মসজিদগুলো সব মুঘল যুগের।

বারোবাজারের মসজিদগুলোর সংখ্যা দেখেও বোঝা যায় যে, সেগুলোতে কত লোক নামাজ পড়ত। এখানেও লাখো মানুষের বাস ছিল। আজ থেকে পাঁচশো বছরেরও বেশিকাল আগে শহর মুহম্মদাবাদ নামে একটি প্রাদেশিক রাজধানী ছিল বারোবাজারে। এখানে বাদেঢিহি এবং নামাজগাহ্তে দু'টো সুলতানি যুগের কবরস্থান পাওয়া গেছে। সেখানে নামিদামি সব মানুষদের কবর ছিল বলে ধরে নেয়া হয়। তবে গোটা এলাকাতেই বহু কবর দেখা যায়। এখানকার মসজিদগুলোর আদি নাম এখন হারিয়ে গেছে। তবে লোকেরা আজকাল একেকটা মসজিদের এককটা নতুন নতুন নাম দিয়ে দিয়েছে। যেমন পীরপুকুর, গলাকাটি, সাদিকপুর ও জোড় বাংলা মসজিদ। এখানে দু'দুটো ৩৫ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ পর্যন্ত ছিল। কত বড় শহর থাকলে এমন বিরাট বড় বড় মসজিদে নামাজ পড়ার মতো লোক পাওয়া সম্ভব!

খলিফতাবাদ

খালিফতাবাদ জায়গাটা ছিল বর্তমান বাগের হাটে। সেখান উলুঘ খান-ই-জাহান নামে একজন নামকরা মানুষ বাস করতেন। উনি খুব ধার্মিক ছিলেন। একজন সাধুপুরুষই ছিলেন তিনি। তবে একই সাথে খুবই সাহসী মানুষও ছিলেন। বীর যোদ্ধাও যে ছিলেন তিনি, তা ইতিহাসের নানা ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। তাঁর জন্ম কবে হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে মৃত্যুর সাল জানা যায়। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। বাগেরহাটেই তার কবরও আছে। এখন লোকজন তাঁকে খান জাহান আলী বলে জানে। মানুষের মনে তিনি খুবই শ্রদ্ধার আসনে রয়েছেন। তবে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের পুরনো যেসব লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে ওই উলুঘ-খান-ই-জাহান নামটাই পাওয়া যায়। এটাও কিন্তু তাঁর নাম কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে এবং পণ্ডিতরা বলছেন এটা তাঁর উপাধি। এ কথার মানে হল জগতের মহান ও সম্মানিত ব্যক্তি। কথা মিছে নয় মোটেই। তিনি তো নিশ্চয়ই খুব মহান এবং সম্মানিত মানুষই ছিলেন। আসলে এমন ঘটনা অনেকই ঘটে। নামকরা মানুষেরা প্রায়ই মানুষের সম্মান ও ভালোবাসায় ধন্য হন। মানুষ তাঁদেরকে

যেসব উপাধি দেয়, এককালে সেই উপাধির চাপে আসল নামটাই হারিয়ে যায়। এক্ষেত্রেও মনে হয় তেমনই হয়েছিল। তো যাই হোক, তিনি কিন্তু অনেক ভালো কাজ করেছিলেন। তাঁর সেরা কীর্তি হল ষাট গম্বুজ মসজিদ। সাতটি সারিতে এর ওপরে ৭৭টি গম্বুজ এবং চার কোণায় চারটি গম্বুজ আছে। সবমিলিয়ে ৮১টা গম্বুজ থাকলেও এর নাম ষাট গম্বুজ কেন হয়েছে তা নিয়ে অনেক মত আছে। এর ভেতরে ষাটটি স্তম্ভ আছে বলেও এমন নাম হতে পারে। আবার সাত সারির গম্বুজ বলে সাত থেকে ষাট কথাটা এসেছে বলেও এর এমন নাম হয়েছে বলে মনে করা হয়। সে যাই হোক, এই ষাট গম্বুজ মসজিদ কিন্তু বাংলাদেশের এক মহা আশ্চর্যজনক প্রাচীন কীর্তি। মসজিদের ভেতরে ঢুকে পাথরের স্তম্ভগুলোর ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় মন ছুটে যায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে। এতবড় মসজিদও কিন্তু এখানে বহু লোকের বসবাস থাকার কথাই প্রমাণ করে। একেবারে রাজকীয় মসজিদ ছিল এটা। এর ভেতরে শাসন কাজের জরুরি সভা এমনকি ছাত্রদের ক্লাস নেয়াও সম্ভব ছিল। আবার ছাদ থেকে উঠে যাওয়া উঁচু মিনারগুলোর ভেতর থেকে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যেত। তাই সৈন্যদের পাহারা দেয়ার জন্যেও এ মসজিদের ব্যবহার ছিল বলে মনে হয়। সবমিলিয়ে এমন প্রাচীন মসজিদ বাংলাদেশে আর একটাও নেই। এটা এদেশের সবচেয়ে বড় প্রাচীন মসজিদ। তবে এটাই শুধু কথা নয়। আরও অনেক বেশি মর্যাদা এ মসজিদের। এটি এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্গত। সারা বিশ্বের মানবজাতির অমূল্য ঐতিহ্য ও সম্পদ হিসেবে এখন সবাই এটিকে মেনে নিয়েছেন। কত বড় সম্মান আমাদেরকে এই মসজিদ এনে দিয়েছে। আর এই মসজিদ যিনি নির্মাণ করেছিলেন সেই উলুঘ-খান-ই জাহান কত সম্মান পাবার অধিকারী তাও ভেবে দেখ একটু। তবে শুধু এই একটি মাত্র মসজিদ নয়, আরও অনেক মসজিদ তিনি বানিয়েছিলেন গোটা এলাকায়। এর সবগুলো এখন পর্যন্ত টিকে নেই। যেগুলো টিকে আছে সেগুলোও কম সুন্দর নয়। মানুষের পানির কষ্ট মেটানোর জন্যে অনেক দিঘি তিনি খুঁড়েছিলেন, বানিয়েছিলেন বহু সড়ক। তিনি খুব নামকরা শাসকও ছিলেন। তিনি ন্যায়বিচার করতেন বলে আজও লোকমুখে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে তিনি স্বাধীন কোনো শাসক ছিলেন না। এখানে একটা শাসন কেন্দ্র ছিল বটে, কিন্তু কোনো স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী সেটা ছিল না। তিনি গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন কাজ চালাতেন। খলিফা কথাটার মানেও কিন্তু

প্রতিনিধি। তাই প্রতিনিধির বসবাসের জায়গা বলে তাঁর শাসনকেন্দ্রের নাম হয়েছে খলিফতাবাদ।

সোনারগাঁও

সুলতানি যুগে বাংলাদেশে আর একটা খুব নামকরা শহর ছিল। সেটার নাম সোনারগাঁও। প্রায় ছয়শো বছর আগে থেকে এটি বাংলার স্বাধীন সুলতানদের রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। সেই শহরের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছিল ব্রহ্মপুত্র। সেকালের সেই ব্রহ্মপুত্র আর আজকের ব্রহ্মপুত্র এক নয়। সেই ব্রহ্মপুত্র এখন শুকিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও তা সাধারণ একটা ছোট নদী হয়ে গেছে। কিন্তু সেকালে ব্রহ্মপুত্র ছিল মস্ত নদী। যাকে বলে প্রমত্তা নদী। এ নদী এদেশে এসেছে ভারতের আসাম থেকে। আর ভারতে ঢোকার আগে সেটা এসেছে চীন থেকে। তার মানে চীন থেকে আসা নদী এটা। তবে যতই এটা সাগরের কাছাকাছি হয়েছে, ততই এটা গভীর হয়েছে এবং হয়েছে চওড়া। সেকালে সাগর অতটা দক্ষিণে ছিল না। সেই সাগর থেকে জাহাজ চলে আসত সোজা সোনারগাঁয়ের বন্দরে। দেশ-বিদেশের অতিথিরা সোনারগাঁও বন্দর থেকে জাহাজে চেপে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চলে যেত ইন্দোনেশিয়া এমনকি চীন পর্যন্ত। সেই সোনারগাঁয়ের বেশির ভাগই এখন হয় ধ্বংস হয়ে হারিয়ে গেছে, অথবা নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। তবে এখনও সেখানে একটা পাথরে বাঁধানো পুরনো কবর আছে। সেটাকে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের কবর বলে অনেকেই মনে করেন। ইনি ছিলেন বাংলাদেশের খুব বিখ্যাত একজন সুলতান। তাঁর রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়ে। অবশ্য সেকালের প্রাচীন মসজিদের কোনো কোনোটা এখনও টিকে আছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল সোনারগাঁয়ে। মুঘল যুগের এক বিখ্যাত শাসক ঈশা খাঁর নামের সাথেও জড়িয়ে আছে সোনারগাঁয়ের কথা। ঈশা খাঁয়ের সাথে জড়িয়ে আছে কিশোরগঞ্জের এগারসিন্দুর ও জঙ্গল-বাড়ির নামও। তাই আমরা যখন ভাবি, এককালে সোনারগাঁয়ে ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী তখন গর্বে ফুলে ওঠে আমাদের বুক। সোনারগাঁয় বাংলাদেশের রাজধানী স্থাপিত হবার আগেও কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল। সেকালের ইমারত ও ধর্মকেন্দ্রে ব্যবহৃত পাথরখণ্ড আজও কিন্তু দেখা যায়। হতে পারে ছোটখাটো কোনো শাসকের শাসনকেন্দ্র ছিল সেটা।

রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁয়ের খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখন কিন্তু অনেক নামকরা মানুষেরা এসেছেন সোনারগাঁয়ে। দেশে ফিরে গিয়ে তারা যেসব বিবরণী লিখেছেন তাতে খুবই মর্যাদার আসনে তারা বসিয়েছেন শহরটাকে। আশপাশের দেশ ছাড়াও ইউরোপের নানা দেশের মানুষ হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে জাহাজে চেপে এসেছেন সেই শহরে। আবার চীনের রাজদূতেরাও এসেছে। এসেছে ইরানের অতিথিও। তখন বাংলাদেশ ছিল দুনিয়ার সেরা ধনী দেশগুলোর একটা। প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি ছিল এখানে। এসব দেখে বিদেশিরা যেসব বিবরণ লিখে গেছেন সেগুলোর মধ্যে খুবই খ্যাতিসম্পন্ন হল ইবনে বতুতার বিবরণ। কী, ইবনে বতুতার নাম তো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। সেই বিশ্ববিখ্যাত মানুষ, যিনি সারা দুনিয়া ঘোরার পরও ভোলেননি বাংলাদেশকে, ভোলেননি সোনারগাঁকে। তাঁর লেখা থেকে আমরা সেকালের সোনারগাঁর কথা যেমন জানতে পারি, তেমনি জানতে পারি গোটা বাংলাদেশের কথাই। তাঁর লেখা পড়েই আধুনিক কালের মানুষ জানতে পেরেছে যে, সেকালে বাংলাদেশেই জিনিসপত্রের দাম ছিল গোটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে শস্তা! কেমন ছিল সেই ইবনে বতুতার দেখা বাংলাদেশ? চলো তাঁর চোখ দিয়ে আমরাও দেখি সেই পুরনো বাংলাদেশকে।

ইবনে বতুতার চোখে বাংলাদেশ

১৩০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন উত্তর আফ্রিকার মরক্কোর তানজিয়ার শহরে। তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে একুশ বছর বয়সে মক্কায় হজ্ব পালনের পর মিশর, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশ তিনি ভ্রমণ করেন।

১৩৩০ থেকে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ ও রাশিয়া ভ্রমণ করেন। তারপর আফগানিস্তান হয়ে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু এলাকায় পৌঁছে যান।

তিনি কাজী পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং বিজ্ঞান, ভূগোল, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে খুব পণ্ডিত ছিলেন। ইসলামের ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আইন-কানুন বিষয়েও তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এসব কথা জানতে পেরে দিল্লির তখনকার সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দিল্লির প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৩৪২

মরুর জাহাজ উটের পিঠে চড়েই সুদূর আফ্রিকা থেকে বিশ্বভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েছিলেন ইবনে বতুতা। তবে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন জাহাজে করে

খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতানের দূত হিসেবে চীনের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা দেন। কিন্তু চীনে আর তাঁর যাওয়া হল না। পথে তিনি ডাকাতের কবলে পড়েন এবং সবকিছু খুইয়ে মালদ্বীপে যান। সেখানেও তিনি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং বছর দেড়েক থাকেন। তারপর শ্রীলংকা হয়ে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর বাংলাদেশে আসার প্রধান কারণ ছিল সিলেটে গিয়ে হযরত শাহ্‌জালালের (রহঃ) সাথে দেখা করে তাঁর দোয়া নেয়া। তিনি এতে সফল হয়েছিলেন। শাহ্‌জালালের (রহঃ) শেষ জীবনে তিনি তাঁর সাথে দেখা করেন।

১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে শাহ্‌জালাল আরবের ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে ৩৬০ জন সঙ্গীসহ তিনি সিলেটে গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫০ বছর বয়সে তিনি সিলেটে প্রাণত্যাগ করেন। এর এক বছর আগে ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বতুতা সোনারগাঁয়ের নৌ-বন্দর থেকে জাহাজে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন যে, তিনি বাংলার সাদকাওয়ান বন্দরে এসে নেমেছিলেন। অনেক পণ্ডিতই মনে করেন যে,

সাদকাওয়ান হল চট্টগ্রাম। সে সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্ (১৩৩৮ খ্রি.-১৩৪৯ খ্রি.)। ইবনে বতুতা লিখেছেন "বাংলার সুলতান তখন ফখরুদ্দিন। শাসনকর্তা হিসেবে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন। মুসাফিরদের বিশেষত দরবেশ ও সুফিদের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করতেন।"

ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম থেকে তিনি নদীপথে সিলেটে যান। আসামের কামরূপ এলাকার লোকদের যাদুবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের কথা তিনি তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। সিলেট ভ্রমণ সম্পর্কে ইবনে বতুতা লিখেছেন- "আমার এ পার্বত্যাঞ্চল ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শেখ জালাল উদ্দিন নামক এক বিখ্যাত ধর্মপ্রাণ দরবেশের সঙ্গে দেখা করা। তাঁর বাসস্থান থেকে দু'দিনের পথ দূরে থাকতেই আমি তাঁর চার শিষ্যের দেখা পেলাম। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, শেখ তার সঙ্গী দরবেশদের বলেছেন, 'পশ্চিম দেশের একজন সফরকারী তোমাদের কাছে এসেছেন, তোমরা গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাও।' আমার সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। এ ব্যাপারে তাঁর ওপর নাজিল হয়েছে। আমি তাঁদের সঙ্গে গুহার বাইরে অবস্থিত তার আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম।

"সেখানে কোনো রকম আবাদি জমি নেই। কিন্তু মুসলমান ও অমুসলমান নির্বিশেষে সেখানকার অধিবাসীরা নানারকম দ্রব্য নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসে।"

"শেখের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে রয়েছে একটি মাত্র গরু। প্রতি দশ দিন অন্তর তিনি গরুর দুধ খেয়ে ইফতার করেন। একমাত্র তাঁর চেষ্টাতেই এ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।"

সিলেট থেকে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও-এ আসার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা' এরকম "শেখ জালাল উদ্দিনের কাছে বিদায় নিয়ে আমি হাজং পৌঁছি। কামারু (কামরূপ বোঝানো হয়েছে) পর্বত থেকে উৎপন্ন একটি নদীর দু'পাড়ে বিস্তীর্ণ এ সুন্দর শহরটি। নদীটির নাম নীল নদী (এখানে মেঘনা নদীকে বোঝানো হয়েছে)। এ নদীপথেই বাংলা ও লক্ষ্মণাবতী যেতে হয়... আমরা পনেরো দিন অবধি এ নদী দিয়ে ভাটির দিকে এগিয়ে গেলাম। নদীর দু'পাশে গ্রাম ও ফলের বাগান দেখে মনে হচ্ছিল আমরা যেন একটি বাজারের ভেতর দিয়ে চলেছি। অসংখ্য নৌকা চলাচল করছে এই নদীতে। প্রত্যেক নৌকায় একটি করে ঢাক। এক

নৌকার সঙ্গে অন্য একটি নৌকার দেখা হলে প্রত্যেকে নিজ ঢাক পেটায় এবং একে অন্যকে অভিবাদন জানায়। এটি সুলতান ফখরউদ্দিন-এর হুকুম। দরবেশের কাছ থেকে এ নদীতে চলাচলের জন্যে কোনো কর আদায় করা হবে না। তাঁদের কারও খাদ্যের সংস্থান না থাকলে খাদ্যও দিতে হবে। কোনো দরবেশ শহরে এলে তাঁকে আধা দিনার দেয়া হয়। ১৫ দিন নদী পথে চলে আমরা সোনার কাওয়ান (এখানে সোনারগাঁওকে বোঝানো হয়েছে) এসে পৌঁছলাম।"

বাংলাদেশ সম্পর্কে ইবনে বতুতা লিখেছেন

"দীর্ঘ তেতাল্লিশ রাত সমুদ্রের বুকে কাটিয়ে আমরা বাঙলা দেশে পৌঁছলাম। এই বিশাল দেশে প্রচুর চাল উৎপন্ন হয়। সারা পৃথিবীতে আমি এমন কোনো দেশ দেখিনি, যেখানে জিনিসপত্রের দাম বাংলার চেয়ে কম। এক দিরহামে আটটি মোটা তাজা মুরগি, দুই দিরহামে ১টি মোটাতাজা ভেড়া এখানে বিক্রি হতে আমি দেখেছি।"

"সমুদ্রোপকূলে বাংলার যে বৃহৎ শহরে আমরা প্রবেশ করি, তার নাম সাদকাওয়ান (এখানে চট্টগ্রামকে বোঝানো হয়েছে)। এ শহরের কাছে গঙ্গা ও জুন নদী (এখানে যমুনা অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রকে বোঝানো হয়েছে) একত্রে মিলিত হয়ে সাগরে পড়েছে। গঙ্গা নদীতে হিন্দুরা তীর্থ করতে আসে।"

ইবনে বতুতা তাঁর বর্ণনায় তদানীন্তন বাংলার রাজনীতি ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেও তথ্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় হযরত শাহ্জালালের জনপ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতারও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সোনারগাঁও থেকে ইন্দোনেশিয়া হয়ে চীন গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে ইন্দোনেশিয়া যাত্রা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন

"এখানে এসে একটি নৌকা পেলাম যেটা জাভা (সুমাত্রা) যাত্রার জন্যে তৈরি। এখান থেকে সুমাত্রা চল্লিশ দিনের পথ আমরা সেই নৌকায় আরোহণ করলাম।"

ইবনে বতুতা আটাশ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী এক লক্ষ বিশ হাজার কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করেছিলেন। দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোয় ফিরে যাবার পর তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। নিজ দেশেও তিনি যথেষ্ট সম্মান পেয়েছিলেন। তিনি সেখানকার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এতকাল পরেও বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলো সবার কাছেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ঈশ্বরীপুর

সাতক্ষীরা জেলায় শ্যামনগর নামের যে উপজেলাটা আছে তার অন্তর্গত খুব প্রত্যন্ত একটা জায়গার নাম ঈশ্বরীপুর। অবশ্য এখন ততটা প্রত্যন্ত নেই রাস্তাঘাট হবার সুবাদে। কিন্তু দূরত্বের বিবেচনায় এখনও প্রত্যন্তই বলা যায়। তবে চার-পাঁচ শো বছর আগে রীতিমতো দুর্গম অঞ্চলই ছিল জায়গাটা। কারণ সেখানে কোনো জনবসতি ছিল না। ওটা ছিল সুন্দরবনের ভেতরে। সেই দুর্গম বনেই এসে আস্তানা গেড়েছিলেন শ্রীহরি ও বসন্তরায় নামের দু জনা। এরা ছিলেন দুই ভাই। বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ কররানির বিপদের দিনে তাঁর কর্মকর্তা শ্রীহরি বুঝেছিলেন দিল্লির, বাদশাহ আকবরের বাহিনীর হামলার ধাক্কা শেষ পর্যন্ত দাউদ কররানি সামাল দিতে পারবেন না। তাই ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে দু ভাইয়ে মিলে ধনসম্পদসহ রাজধানী গৌড় থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন সুন্দরবন ঘেরা এই জায়গাটায়। এখানে তাঁরা দুর্গ এবং রাজধানী বানিয়ে নতুন এক রাজ্য গড়ে তোলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীর দালানকোঠা অবশ্য কাছাকাছি এলাকার ধুমঘাট পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। রাজা হয়ে শ্রীহরি নতুন নাম 'বিক্রমাদিত্য' গ্রহণ করলেন। মৃত্যুর পর

ঈশ্বরীপুরের প্রাচীন নগরীর নহবতখানার ধ্বংসাবশেষ

তাঁর ছেলে রাজা হলেন। ইনি নাম ধারণ করলেন প্রতাপাদিত্য। তাঁর আমলে অনেক বড় বড় অট্টালিকা, মন্দির, মসজিদ ও গির্জা নির্মিত হয়েছিল। এখানকার গির্জাকেই বাংলাদেশের প্রথম গির্জা বলে মনে করা হয়। প্রতাপদিত্যের সৈন্যবাহিনীতে যেসব পর্তুগীজ সৈন্য ছিল তাদের উপাসনার জন্যে এই গির্জা নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য এখন আর গির্জাটা টিকে নেই। কিন্তু সেখানে একটা ঢিবি হয়ে আছে। ঈশ্বরীপুরে একটা তিনকোণাকার প্রাচীন মন্দির তখন নির্মিত হয়েছিল। সেই মন্দিরকেই এদেশের সবচেয়ে প্রাচীন তিনকোণাকার মন্দির বলে মনে করা হয়। পুরো মন্দিরটা এখন ভেঙ্গে পড়লেও এটার ভিত্তি দেয়াল কোনো রকমে এখনও টিকে আছে।

প্রতাপাদিত্যের সেনাদলে বহু মুসলমান সৈন্য ছিল। তাদের নামাজ পড়ার জন্যে সেকালে মসজিদও নির্মিত হয়েছিল। নিকটবর্তী এবং বংশীপুরের টেংগা মসজিদকে তেমন একটি প্রাচীন মসজিদ বলেই মনে করা হয়। যশোরেশ্বরী মন্দির নামের একটা মন্দির সেই প্রতাপাদিত্যের আমলেই নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে পরে এই মন্দিরের অনেক সংস্কার হয়েছে। মন্দিরটির সামনে যে বিশাল দোতলা প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ দেখা যায় তাকে এখন লোকে বলে নহবতখানা। এর বেশ কাছেই রয়েছে হাম্মামখানা নামের বিচিত্র ধরনের এক ইমারত। এসবই ধরে রেখেছে প্রতাপাদিত্যের যুগকে। যদিও প্রতাপাদিত্য ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে মুঘলবাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে রাজ্য হারা হয়েছিলেন। পরে তাকে ধুমঘাট থেকে ধরে আনা হয়েছিল তখনকার বাংলার রাজধানী ঢাকাতে।

ঢাকা

আজ থেকে ঠিক সাড়ে ৫০০ বছর আগের কথা। সেটা ছিল ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দ। তখন বাংলাদেশে (বাংলায়) চলছিল সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্ব। তখনো কিন্তু বাংলা (বর্তমানের বাংলাদেশ) ছিল একটা স্বাধীন দেশ। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত টানা ২০০ বছর অটুট ছিল আমাদের সেই স্বাধীনতা। তখনকার শাসকদের বলা হতো সুলতান এবং তাদের যুগকে বলা হতো সুলতানি যুগ তো, সেই সুলতানি যুগে ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরের নারিন্দা পুলের উত্তর দিকে একটি সুন্দর পাকা মসজিদ বানানো হয়েছিল। সেই মসজিদ বানিয়েছিলেন মুসাম্মাৎ বখত বিনত। মসজিদটির নাম এখন বিনত বিবির মসজিদ। বোঝাই যাচ্ছে ঢাকা

ঢাকার মুঘল যুগের কীর্তি লালবাগের কেল্লার হাম্মামখানা

তখনো একটা গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল। ঢাকার আসল গৌরবের শুরু হয়েছিল মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬০৮ বা ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে। তখন ঢাকাকে গোটা বাংলার রাজধানী করা হল। তার মানে ঢাকা রাজধানী হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল আজ থেকে ৪০০ বছর আগে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে যত আধুনিক শহর আছে, তার কোনোটাই এত পুরনো নয়। সে আমলেই ঢাকা ছিল এক জাঁকজমকপূর্ণ শহর। বিনত বিবির মসজিদকে বাদ দিলে ঢাকা শহরে আর যত প্রাচীন মসজিদ আছে সবই মুঘল যুগের। মোহাম্মদপুরের জাফরাবাদে অবস্থিত সাতগম্বুজ মসজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের পেছনের মুসা খাঁর মসজিদ, নিউমার্কেটের পূর্বদিকের মরিয়ম সালেহার মসজিদ, শিশু একাডেমী ভবনের উত্তর দিকের খাজা শাহবাজের মসজিদ– যেটাই দেখ না কেন, সবই খুব সুন্দর। এছাড়াও হোসনি দালান, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, লালবাগ দুর্গ প্রভৃতি চমৎকার ইমারতও বানানো হয়েছিল সে যুগেই। এগুলোর মধ্যে লালবাগের কেল্লার জৌলুশ অন্যরকম। এর মধ্যে আছে দোতলা হাম্মামখানা, মস্ত গম্বুজবিশিষ্ট পরীবিবির মাজার ও একটি মসজিদ। এই সৌন্দর্যের কারণে বহুকাল ধরে এই দুর্গ বা কেল্লাকে ঢাকার প্রতীক বলে মনে করা হয়ে আসছে। তার মানে

এই দুর্গ বা এর ছবি দেখলেই আমরা ঢাকাকে চিনে নিতে পারব। দুর্গের ভেতরের পরীবিবির মাজারের খ্যাতি দুনিয়াজোড়া।

১৭০৪ সালে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে চলে যাওয়ার পর ঢাকার জৌলুশ কমে যায়। তবে তা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। এর বহুকাল পর ১৯০৫ সালে আসাম ও পূর্ববঙ্গ নামের আলাদা প্রদেশ হল। সেই প্রদেশের রাজধানী হল ঢাকা। তবে ১৯১১ সালে এই নতুন প্রদেশ বাতিল হল। আবারো ঢাকা হারাল রাজধানীর গৌরব। তবে গোটা পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শহর হিসেবেই টিকে রইল এ শহর। তারপর ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হল। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশ পড়ল পাকিস্তানের ভাগে। ঢাকা হল পূর্ববঙ্গের রাজধানী। পরে এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হল। এই নতুন দেশের রাজধানী হল ঢাকা। এখন সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শহরগুলোর মধ্যে ঢাকাও একটি। এখানে আজ ১ কোটিরও বেশি লোক বাস করে। ঢাকা আজ বাংলাদেশের মানুষের গর্বের শহর।

ভুলে যাওয়া শহর

এসব শহর ছাড়াও অনেক শহর এদেশে ছিল। হয় এসব শহরের অনেকগুলোই এখনও আবিষ্কার হয়নি। আবার কিছু কিছু শহর ছিল সেগুলো নদীর ভাঙ্গন বা ভূমিকম্পে অথবা বন্যার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা সবাই জানি সেন বংশের রাজা লক্ষণ সেন এবং পরে তাঁর বংশধররা অনেকদিন ধরে বিক্রমপুরে রাজত্ব করেছেন। বিক্রমপুর নামটা কিন্তু আমরা আজও জানি। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিক্রমপুর খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিক্রমপুর নামের প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আমরা সেভাবে আজও চিহ্নিত করতে পারিনি।

কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি এলাকা থেকে পণ্ডিতরা প্রাচীনকালের কত কিছু যে আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে আছে পাথরের মূর্তি, মাটির তৈরি প্রাচীন পাত্র, পোড়ামাটির ফলক, মুদ্রা এসব। এখানকার অনেক মুদ্রা পরীক্ষা করেই জানা গেছে যে, সেসব মুদ্রা কাদের আমলে চালু হয়েছিল। সে থেকে বোঝা গেছে কোন্ কোন্ বংশের কোন্ কোন্ রাজ্য শাসন করেছেন। এমনকী তাদের রাজ্যের সীমানা কতদূর পর্যন্ত ছিল তা'ও আবিষ্কার করেছেন পণ্ডিতরা। কিন্তু মুদ্রার গায়ে লেখা 'পট্টিকেরা' কতটুকু এলাকা জুড়ে ছিল,

ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যাচ্ছে না নির্ভুলভাবে। আজ থেকে প্রায় একহাজার দু'শো বছর আগে দেব পর্বত নামের একটা শহর ছিল কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ি এলাকায়। ছিল রোহিতগিরি নামের শহরও। তবে তা ঠিক কোথায় তা বলা সহজ নয়। কর্মান্ত নামের একটা প্রাচীন শহর কুমিল্লা শহরের কাছাকাছি কোনো এলাকায় ছিল বলে জানা যায়। তবে তা যে কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমের 'বড় কামতা' গ্রামেই ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এমন আরও অনেক হারানো শহরও আছে এই দেশে।

রাজা-মহারাজাদের গল্প

গমগম করছে রাজপুরী। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কোনো কিছুরই অভাব সেখানে নেই। সেই পুরীতেই বাস করেন রাজা। তিনি দেখতে যেমন 'সুপুরুষ, তেমনি তার বীরত্ব। রাজার আছে মস্ত সেনা দল। ঢাল-তলোয়ার হাতে কুচকাওয়াজ করতে করতে সৈন্যরা যখন রাজপথ দিয়ে এগিয়ে যায় সামনে, তখন সেই দৃশ্য দেখে কারো চোখেরই পলক পড়ে না।

এমন রাজপ্রাসাদ আর রাজার কাহিনী আমরা সবাই পড়েছি রূপকথায়। কাহিনীগুলো যে পুরোপুরি মিছে তা কিন্তু নয়। অমন রাজপুরী আর রাজাদের এক সময় সত্যি সত্যিই দেখা যেত। আমাদের দেশেও এক সময় রাজত্ব করতেন রাজারা। তাদের অনেকের খ্যাতি ইরান, তুরান, ছাড়িয়ে সুদূর ইউরোপেও ছাড়িয়ে পড়েছিল। এখন কথা হল, বাংলাদেশের প্রথম রাজা কে ছিলেন? কী ছিল তার পরিচয়? প্রশ্নটি বড়ই জটিল। তবে জবাব খুঁজতে তো আর দোষ নেই। তাহলে দেখা যাক কে ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাজা। অবশ্য একটা কথা বলে রাখা ভালো, আগেকার দিনে আজকালের মতো বাংলাদেশ নামে একক কোনো দেশ ছিল না বলে বাংলাদেশের প্রথম রাজা বলতে এই ভূখণ্ডের যেকোনো অঞ্চলের প্রথম রাজাকে বোঝালেই চলবে। কারণ এই দেশটা সেকালে বহু ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মহাবীর আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সময় থেকে উপমহাদেশের লিখিত ইতিহাস প্রণয়নে গ্রিক ঐতিহাসিকদের ভূমিকা ছিল। যদিও পৌরাণিক বা মহাকাব্যের উৎস থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং রাজন্যবর্গ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সে-সব তথ্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের বিবরণ প্রসঙ্গে গঙ্গারিদি রাষ্ট্রের কথা জানা যায়। এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল প্রাচীন বঙ্গের প্রায় পুরোটা এবং আশপাশের অনেক এলাকা। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের মহাকাব্য রামায়ণে (কারো কারো মতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা পঞ্চম শতকের দিকে রচিত) ও ঐতরেয় আরণ্যক-এ বঙ্গের উল্লেখ স্পষ্টভাবে আছে। বঙ্গের আয়তন চিরকাল একরকম ছিল না। কোনো কোনো সময় অবিভক্ত বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন ঋকবেদের ঐতরেয় আরণ্যক-এ বঙ্গ, মগধ ও চের-এর উল্লেখ থাকায় এই রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের আগে থেকেই ছিল বলে ধরে নেয়া হয়। ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষায়–

ইমাঃ, প্রজাস্তিস্রো অত্যায়, মায়ং স্তানীমানি বয়াং সি।
বঙ্গ-মগধাশ্চের পাদান্যন্যা, অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।

বৈধায়নের কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্মসূত্রে বঙ্গের উল্লেখ আছে। এসব সূত্রে বঙ্গ সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা পাওয়া যায় না। তবে বাল্মিকীর রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জাতির সাথে বঙ্গের উল্লেখ আছে। যেমন–

সুহ্মান্ মাল্যান্ বিদেহাংশ্ব মলয়ান কাশিকোশলান
মগধান্ দণ্ড-কুলাংশ্ব বঙ্গানঙ্গাংস্থানৈচ

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে–

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মাধেষুচ
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছুন্ পুন:সংস্কার মর্হতি

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত মহাকাব্য মহাভারতের আদিপর্বে আছে–

অঙ্গো বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুন্ড্র সুহ্মাশ্চ তে সুতা;
তেষাং দেশা সমাখ্যাত স্বনাম কথিতা ভুবি

বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শালাতুর গ্রামে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি কোনো সময়ে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ পাণিনির গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ীতে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে বঙ্গের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈদিক, মহাকাব্য ও পৌরাণিকসহ অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে বঙ্গ, পুন্ড্র প্রভৃতি জাতি বা রাজ্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এসব রাজ্য বা সেগুলোর অংশবিশেষ বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব এলাকায় অধিকার প্রতিষ্ঠার পর খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে বিপাশার তীরে এসে ম্যাসিডোনিয় বীর আলেকজান্ডার যখন আরও পূর্বে এগোতে চাইলেন তখন তিনি গঙ্গারিদি রাষ্ট্রের কথা শুনেছিলেন বলে জানা যায়। কার্তিয়াস, প্লুতার্ক ও সলিনাসের লেখা থেকে জানা যায় যে, এই রাজ্য ছিল গঙ্গানদীর পূর্ব দিকে। আলেকজান্ডারের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৬-৩২৩)

মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের অংশবিশেষের অধিপতি সেলুকাস পাটলিপুত্রের মৌর্য রাজসভায় দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন মেগাস্থিনিসকে। ইনি খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ থেকে ২৯৮ অব্দ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৮) রাজদরবারে ছিলেন এবং তৎকালীন ভারতের নানা বিষয় সম্পর্কে 'ইন্ডিকা' নামের বিখ্যাত গ্রন্থ লেখেন। এই ইন্ডিকার অনেক বিবরণের সাথে মহাভারতের বহু বিবরণের হুবহু মিল আছে। পরবর্তীতে বিলুপ্ত গ্রন্থ 'ইন্ডিকা'কে নির্ভর করে ঐতিহাসিক ডিওডোরাস লিখেছেন,

> ৩০ স্টেডিস চওড়া এ নদী (= গঙ্গা) উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রবাহিত হয়ে মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে, যা গঙ্গরিডয় জাতির পূর্বসীমানা নির্দেশ করেছে, যাদের আছে সর্বোচ্চ সংখ্যক হাতি 40,000 রণহস্তী।
>
> গঙ্গারিডয় ও গঙ্গারিদি যে অভিন্ন সেটা সবাই মানেন। তবে শুধু গঙ্গারিদি নয় প্রাচ্যরাষ্ট্রের কথাও গ্রিক বিবরণ থেকে জানা যায়।
>
> মেগাস্থিনিসের ভাষায় প্রাসিই বা প্রাচ্য রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র এবং এর পূর্বের রাজ্যের নাম ছিল গঙ্গারিদি। ডিওডোরাসের বর্ণনায় আরও দেখা যায় যে, "ভারতে বহু জাতির বাস, যার মধ্যে গঙ্গারিডি হল শ্রেষ্ঠ, যাদের বিরাট হস্তীবাহিনীর পরাক্রমের কথা শুনে আলেকজান্ডার এদিকে আর অভিযান চালানোর কথা ভাবেননি। এই এলাকাটা ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে ৩০ স্টেডিয়া চওড়া প্রমত্তা নদী দিয়ে আলাদা করা

গঙ্গারিদি ও প্রাচ্য মিলে একটা যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ মিলিত রাষ্ট্র গড়ে ওঠার কথাও অনেকে বলেছেন এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ শহর গাঙ্গের কথাও টলেমির রচনায় আছে। আছে পেরিপ্লাস গ্রন্থে। তবে গঙ্গারিদি এবং প্রাচ্যরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক আলেকজান্ডারের সময় সত্যিকারভাবে কী ছিল তা নিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত আসা কঠিন। প্রাসিই ও গঙ্গারিদি দুটো আলাদা জাতি হলেও একজন রাজার অধীনে ছিল এবং সেই রাজা ছিলেন আগ্রামিস– এমন কথা কার্তিয়াসের লেখায় পাওয়া যায়। ডিওডোরাসের লেখায় দুটো জাতির একজন রাজার কথা বলা হয়েছে, যার নাম জান্দ্রামেস। তাঁর ভাষায় এক রাজার অধীনস্থ মানুষদেরকে গঙ্গারিদি বলা হয়েছে। আবার প্লুতার্কের ভাষায় গঙ্গারিদি ও প্রাসিই'র 'রাজ্যসমূহ' বলায় এ-বিষয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। প্লুতার্কের বর্ণনা অনুযায়ী আলেকজান্ডারের অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার জন্যে তৈরি ছিল ২ লক্ষ পদাতিক, ৮০ হাজার অশ্বারোহী, ৮ হাজার যুদ্ধরথ

ও ৬ হাজার রণহস্তী। ডিওডোরাস ও কার্তিয়াসের বিবরণীর সাথে এর কিছু পার্থক্য ছিল। তবে অনুমান করা চলে যে, এক বা একাধিক রাজা প্রাচ্য ও গঙ্গারিদির শাসক থাকলেও আলেকজান্ডারের বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গাঙ্গেয় অঞ্চলের শক্তিশালী বাহিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আলেকজান্ডার এই বাহিনীর কথা শোনার পর সৈন্যদের তীব্র অনীহায় তার আর পূর্ব দিকে আসা হয়নি। এ ঘটনায় বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের কোনো না কোনো অঞ্চল পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল এবং সেখানকার রাজার অধীনস্থ ছিল। এরপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পরাক্রমশালী মৌর্যসাম্রাজ্যের পত্তন করেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তাঁর বংশের সম্রাট অশোক উত্তরবঙ্গে মৌর্যসাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন বলে মনে হয়। মৌর্যযুগের অবসানের পর

গুপ্তযুগের ভাস্কর্য

গুপ্তযুগের ভাস্কর্য

ধীরে ধীরে বাংলা অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকেই বাংলায় একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। গুপ্তবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (রাজত্বকাল ৩২০-৩৪০ খ্রিস্টাব্দ) ছেলে সমুদ্রগুপ্তের আমলে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলেই তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। এই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বহু তথ্য এলাহাবাদ দুর্গের ভেতরকার অশোকস্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ মহাকবি হরিষেণের প্রশস্তি থেকে জানা যায়। এই প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত তার রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে যাত্রা করে পূর্বদেশের সমতট (বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চলসহ অনেক এলাকাই সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল), ডবাক, কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। বাংলাদেশের উত্তর ও মধ্য-পূর্বাঞ্চলের অনেক স্বাধীন রাজাই তখন গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাজয় বরণ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের (আনুমানিক ৩৪০-৩৮০ খ্রিস্টাব্দ) পরে দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য (আনুমানিক ৩৮০-৪১২ খ্রিস্টাব্দ) বাংলাদেশে রাজত্ব করেছেন। এ সময়ে বঙ্গ অঞ্চল গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। কতুব মিনারের

নিকটবর্তী দিল্লির মেহেরৌলীর লৌহস্তম্ভের গায়ে চন্দ্র নামের রাজা কর্তৃক বঙ্গের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা আছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) কাকে এই 'চন্দ্র' রাজা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা সহজ নয়। তবে সমুদ্রগুপ্তই প্রথম বঙ্গবিজয় করেছিলেন বলে তথ্য থাকায় তাঁর পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে এই প্রতিরোধ হয়েছিল বলে মনে হয়। এই ঘটনায় সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, গুপ্তরাজত্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হবার আগেও এখানে স্বাধীন রাজা ও রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সমতট কিছুটা স্বাধীনভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল। ৫০৭ বা ৫০৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে কুমিল্লা-ত্রিপুরা অঞ্চলে বিস্তৃত সমতট রাজ্যে রাজত্ব করতেন মহারাজা বৈন্যগুপ্ত। দশ আদিত্য উপাধি ধারণ করে তিনি স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। নালন্দায় প্রাপ্ত একটি সিল থেকে জানা যায় যে তিনি মহারাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। মনে করা হয় যে, বৈন্যগুপ্ত ছিলেন রাজকীয় গুপ্ত পরিবারেরই একজন। তিনি গুপ্তবংশের হয়ে অনেকটা স্বাধীনভাবে বাংলার পূর্বাঞ্চলে শাসন কাজ চালাতে চালাতে গুপ্তশাসনের দূর্বলতা ও সংকটের সুযোগে একসময় স্বাধীনতা ঘোষণা করে ফেলেন। ৫০৭-৫০৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে শাসনকেন্দ্র ক্রিপুর থেকে তিনি ভূমিদান করে তাম্রলেখ উৎকীর্ণ করান। অনেকেই এই ক্রিপুরকে ত্রিপুরা বা তার সন্নিহিত কোনো অঞ্চলে অবস্থিত বলে মনে করেছেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সময় পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় এবং বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এ-সময়ে দক্ষিণ বঙ্গের সুবর্ণ ভুক্তি ও পশ্চিবঙ্গে বর্ধমান ভুক্তি নামের যে দুটো প্রদেশ ছিল তার মধ্যে বর্ধমান জেলায় ১টি ও গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ৫টি লেখ থেকে মহারাজাধিরাজ উপাধিধারী গোপালচন্দ্র, সমাচারদের ও ধর্মাদিত্য নামের তিনজন স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজার অস্তিত্বের কথা জনা যায়। এঁদের সামান্য আগে মহারাজা নামের তুলনামূলক ছোট উপাধি নিয়ে বৈন্যগুপ্ত রাজত্ব করেছিলেন। বঙ্গ ও সমতটের এই সময়ের স্বাধীন কয়েকজন রাজার নাম

১. বৈন্যগুপ্ত (আনুমানিক ৫০৭-৫০৮ খ্রিস্টাব্দ)
২. ধর্মাদিত্য (আনুমানিক ৫২৫-৫৫০ খ্রিস্টাব্দ)
৩. গোপচন্দ্র (আনুমানিক ৫৫০-৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ)
৪. সমাচারদেব (আনুমানিক ৫৭৫-৬০৭ খ্রিস্টাব্দ)

বৈন্যগুপ্ত ও গোপচন্দ্র উভয়েরই অধীনস্থ হিসেবে বর্ধমানভুক্তির বিজয় সেনের কথা মনে করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ ভাগে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে আগে বৈন্যগুপ্ত শাসক ছিলেন। পরে অঞ্চলটি স্বাধীন হয়ে যায়। তবে উপরে বর্ণিত ৪ জন শাসকের পারস্পারিক সম্পর্ক বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সহজ নয়। চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মন ৫৯৭-৫৯৮ সালে শাসন ক্ষমতা হারানোর আগেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করেছিলেন বলে মহাকূট লেখতে দাবি করা হয়েছিল। আবার আনুমানিক ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক মৃত্যুবরণের আগে বঙ্গে স্বাধীন রাজাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে থাকে। তখন এখানকার অন্য শাসকরা শাসনক্ষমতা হারায়। বঙ্গের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলোপ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন।

এতসব সত্ত্বেও অনেকেরই মতে বৈন্যগুপ্ত বাংলাদেশের জানা ইতিহাসে মহারাজধিরাজ উপাধিধারী প্রথম স্বাধীন রাজা। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রথম স্বাধীন রাজার সুনির্দিষ্ট নাম বলা সত্যিই কঠিন।

বৈন্যগুপ্তের রাজধানী হিসেবে ক্রিপুর নামের একটি জায়গার কথা ভাবা হয়। আর ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের রাজ্যসীমার মধ্যে যে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়াও ছিল তা নিশ্চিত। অনেকেই মনে করেন যে, এখানেই ছিল তাদের রাজধানী।

আনুমানিক ৬০০ থেকে ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন রাজা শশাঙ্ক। তাঁর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ নগরে। যতটা জানা যায় শশাঙ্কের রাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকা, বিশেষ করে রাজশাহীর কিছু এলাকা থাকা সম্ভব। তবে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানীটি বর্তমান বাংলাদেশের বাইরে ছিল।

রাজা শশাঙ্কের কাছাকাছি সময়ে কুমিল্লা এলাকায় রাজত্ব করতেন 'রাত' বংশের রাজারা। এঁদের মধ্যে ছিলেন–

১. জীবধারণ রাত (৬৪০-৬৬০ খ্রি.)
২. শ্রীধারণ রাত (৬৬০-৬৭০ খ্রি.)

রাতদের কাছাকাছি সময়ে সমতটে আর একটি রাজবংশ রাজত্ব করত। সেই বংশের নাম খড়্গ বংশ। বংশের নামের মতোই রাজাদের নামও ছিল বেশ বিচিত্র রকমের। যেমন– খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ, রাজভট্ট বা

রাজরাজভট্ট, বলভট্ট, সর্বভট্ট। খড়্গাদের রাজধানী কুমিল্লা এলাকার কর্মান্তবসাক-এ ছিল বলে মনে করা হয়। এদর রাজত্ব শুরু হয়েছিল ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে। খড়্গা বংশের রাজত্ব শেষ হবার প্রায় কাছাকাছি সময়ে রাজত্ব শুরু হয় দেব বংশের। এদের রাজধানী কুমিল্লারই দেবপর্বত এলাকায় ছিল বলে অনুমান করা হয়। আনুমানিক ৭২০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে বিস্তৃত ছিল দেব বংশের রাজত্ব। এই বংশের আমলের বহু কীর্তি কুমিল্লা এলাকা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দ দেব ও ভবদেব নামের এই বংশের রাজাদের খ্যাতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সমতটে দেব বংশের রাজত্ব চলাকালেই বাংলাদেশের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। শশাঙ্কের মৃত্যু হলে গৌড় রাজ্যের মধ্যে দেখা দেয় মহা বিংশৃঙ্খলা। কেউ কাউকে তখন আর মানতে চাইল না। কায়েম হল 'জোর যার মুলুক তার' নীতি। যে যা খুশি তাই করতে লাগল। প্রায় একশো বছর ধরে বাংলাদেশের উত্তর ভাগে চলেছিল এই মহা অন্যায়ের কাল। সেই কালের একটা নামও দেয়া হয়েছে। সেই নাম হল মাৎস্যন্যায়। তো সেই যুগে বাংলাদেশে কোনো শক্তিশালী রাজা না থাকায় যার যেমন খুশি তেমন অন্যায় করার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। তাই বলে দেশে যে কোনো রাজাই ছিল তা নয়। রাজা ছিল, কিন্তু ছিল ছোট ছোট রাজ্যের অনেকগুলো দুর্বল রাজা। এসব রাজারা আবার নিজেদের মধ্যে মারামারি করেই বিরাট সময় নষ্ট করে ফেলত। সেই অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মানুষ রাস্তা খুঁজছিল। কিন্তু তেমন কোনো শক্তিশালী শাসক না থাকায় উপায় বের করা যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ঘটল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গোপাল নামের এক শক্তিশালী রাজা এলেন। তিনি দলাদলি-হানাহানিতে নিয়োজিত গৌড়রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। বেশ সহজেই নিজের যোগ্যতার বলে তিনি এক শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন করলেন। ৭৫০ থেকে ১০৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দাপটের সাথে রাজত্ব করেছিলেন তিনি ও তাঁর বংশধররা। তাঁর নিজের রাজত্ব চলেছিল ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তবে ১০৬০ খ্রিস্টাব্দের পরও বছর চল্লিশেক এই বংশের একাধিক দুর্বল শাসক রাজত্ব করেছিলেন।

বাংলাদেশের উত্তর ভাগ এই সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। এদেশের ইতিহাসে সভ্যতায় পালযুগে হল খুবই গৌরবের। এই বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ। তবে অন্যসব ধর্মের ব্যাপারেও তাঁরা কোনো বাধার সৃষ্টি
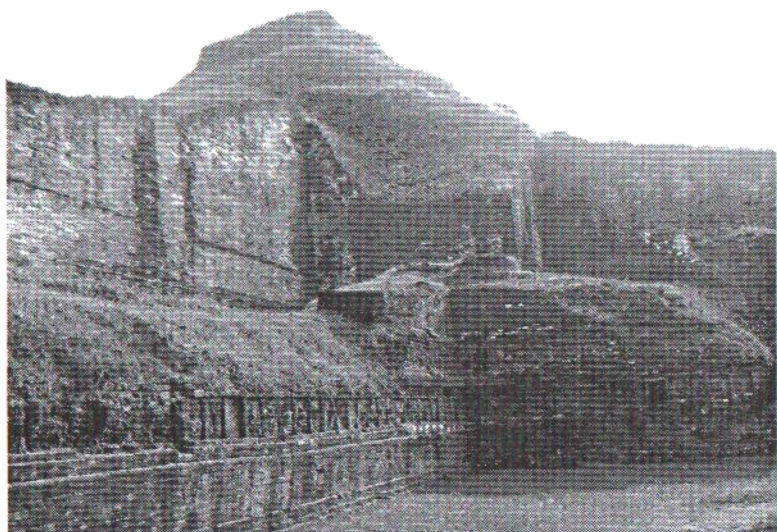
পাল যুগের অমর কীর্তি পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার

করেননি। রাজারা ছিলেন ধার্মিক। এই আমলেই নওগাঁর পাহাড়পুরে, জগদ্দলে এবং আরও অনেক জায়গায় রাজারা নির্মাণ করেছিলেন অনেকগুলো মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়। সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত নানা দেশের ছাত্ররা। হরেক রকমের চমৎকার চমৎকার সব মূর্তি তখন নির্মাণ করেছিল এ দেশের শিল্পীরা। দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল অনেক নগর-মহানগর। এই বংশের বিখ্যাত রাজাদের মধ্যে ছিলেন ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপাল। পাল বংশের রাজত্ব চলাকালেই বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে আনুমানিক ১০৭১ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল কৈবর্ত বংশের তিনজন রাজার রাজত্ব। তবে এরা খুব একটা শক্তিশালী রাজা ছিলেন না। পালরা যখন উত্তর বাংলায় দাপটের সাথে রাজত্ব করছেন তখন কুমিল্লা এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী চন্দ্র বংশের রাজত্ব শুরু হয়। চন্দ্রদের রাজত্ব শেষ হতে না হতেই বর্মা বংশের রাজত্ব শুরু হল। এদের পর পরই এল সেন বংশের শাসন। এই বর্মা এবং সেনদের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল বলেই জানা যায়।

সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে হটিয়ে দিয়ে ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে বখতিয়ারের আগে কোনো
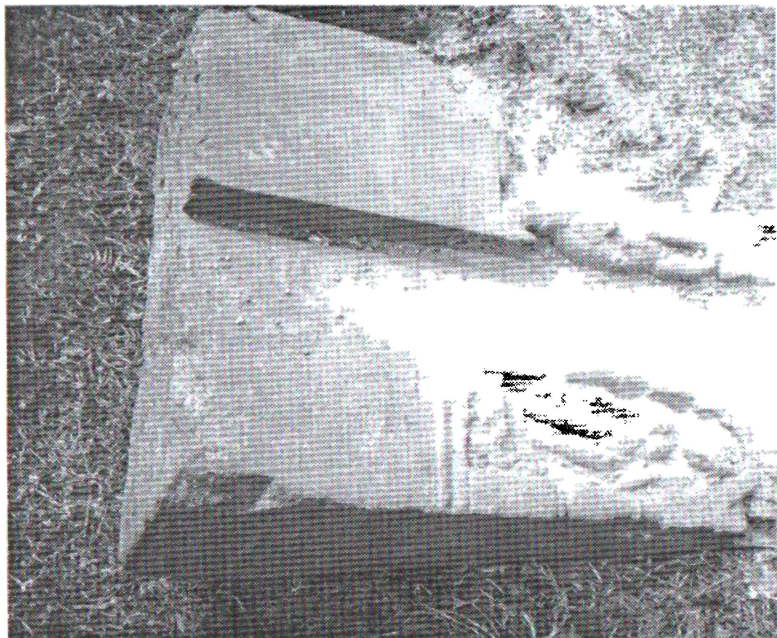
পালযুগীয় শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শণ নওগাঁর জগদ্দল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত এই অসাধারণ রিলিফ

মুসলমানই রাজ্য বিস্তার করতে পারেননি। এই দেশে ইসলাম ধর্মের প্রচারও বখতিয়ারের মধ্যমে হয়েছিল বলে জানা যায়। বখতিয়ার তাই গোটা বাংলাদেশের ইতিহাসটাকেই পাল্টে দিয়েছিলেন। তাঁরই প্রচারণার কল্যাণে আলি মেচ নামের একজন মানুষ প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আলি মেচ এর আগে বাংলাদেশে আর কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় না। বখতিয়ারের সৈন্য, সেনাপতি ও যারা সেই বিজয় দেখেছিল তাদের সাথে আলোচনা করে এবং তাদের কাছ থেকে জেনে একটা বই লেখা হয়েছিল। বইটার নাম তবকাত-ই-নাসিরি। বইটা যিনি লিখেছিলেন তার নাম মিনহাজ-ই-সিরাজ। সেই বইয়ে স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের প্রথম মুসলমান আলি মেচ ও তার কাহিনী লেখা আছে। অবশ্য বখতিয়ার তাঁর জীবনকালে পুরো বাংলাদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বিক্রমপুর, সিলেট ও কুমিল্লা এলাকায় অনেকদিন ধরে চলেছিল অনেক বংশের রাজত্ব। বাংলাদেশের মুসলিম শাসকদের মধ্যে আলি মর্দান খলজিই ছিলেন প্রথম

স্বাধীন শাসক। তবে এদেশে একটানা দু'শো বছরের স্বাধীন সুলতানি শাসনের সূচনা হয়েছিল ১৩৩৮ সালে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী সেনারগাঁ থেকেই এ শাসনের শুরু হয়েছিল। সোনারগাঁই ছিল স্বাধীন সুলতানি যুগের প্রথম রাজধানী। আর এই যুগের প্রথম স্বাধীন সুলতানের নাম ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ্। চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ বাংলাদেশ জুড়েই ছিল তার রাজত্ব। সুলতানি যুগে উল্লেযোগ্য রাজ বংশগুলোর মধ্যে ছিল ইলিয়াস শাহী বংশ, হাবসি বংশ ও হোসেন শাহী বংশ। তবে দু'শো বছরের স্বাধীন সুলতানি যুগ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কোনো কোনো স্বাধীন সুলতান এদেশে রাজত্ব করেছেন। মুঘল বাহশাহ্ আকবর ১৫৭৫ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে কেড়ে নেন। তিনি যার কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেন সেই শাসকের নাম দাউদ খান কররানী। এরপর এদেশে পুরোপুরি চালু হল দিল্লির শাসন। এখানে একটা কথা, পালযুগে বৌদ্ধ রাজাদের আমলে সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা ভাষা। আর সুলতানি যুগে

সেনযুগের ভাস্কর্য

সুলতানি যুগের মুদ্রা

বাংলা সাহিত্য বিরাট উন্নতি করেছিল এবং বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা একেবারে আধুনিক হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। মুঘলরা এদেশে কিন্তু খুব আরামে রাজত্ব করতে পারেনি। ঈশা খাঁর মতো অনেক বীর কিছুতেই দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের সাথে মুঘলদের সব সময়ই যুদ্ধ করতে হয়েছে।

এক সময় মুঘলরাও দুর্বল হয়ে গেল। এই মুঘল যুগেই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে স্থাপিত হয়েছিল। আবার এক সময় তা চলে গেল ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে। সেখানে শুরু হল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবদের এক রকম স্বাধীন শাসন। নবাবরা দিল্লির মুঘল বাদশাহ্দের অধীনতা স্বীকার করতেন বটে কিন্তু কাজেকর্মে খুব একটা অধীন ছিলেন না তারা। সেই অবস্থাতেই এদেশে এল ধুরন্ধর ইংরেজরা। ছলচাতুরি আর মিথ্যে বলায়

এদের জুড়ি ছিল না। ব্যবসা করার ছলে এদেশে এসে তারা দুর্গ বানিয়ে সৈন্য আনতে শুরু করেছিল। তখন নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। তিনি ইংরেজদের ছলচাতুরি বুঝলেন। তাই ১৭৫৬ সালের ১৮ জুন তারিখে নিজের সেনাদল নিয়ে কোলকাতা ইংরেজ ঘাঁটিতে হাজির হলেন। যুদ্ধ হল। নবাব জিতলেন। কিন্তু দুষ্ট ইংরেজদের ক্ষমা করে দিলেন। যার দয়ায় ইংরেজরা প্রাণে রক্ষা পেল তাঁর বিরুদ্ধেই তারা ভীষণ মিথ্যে গল্প ফেঁদে বসল এবং একের পর এক ছলচাতুরি করে বাংলাদেশটাকে নিজের দখলে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। সিংহাসনে বসানোর লোভ দেখিয়ে তলে তলে হাত করল নবাবের সেনাপতি মীর জাফর আলি খানকে। ক্ষমতা আর টাকা পয়সার লোভে কয়েক জন দুরাত্মা বাঙালি ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশের সর্বনাশ করল। সে সব দুরাত্মার মধ্যে ছিল রাজা রাজ বল্লভ, ইয়ার লতিফ খান, জগৎশেঠ, উঁমিচাঁদ ও রাজা দুর্লভ রাম। এদের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট ছিল জগৎশেঠ। ইংরেজদের নেতা ছিল কর্ণেল ক্লাইভ, এডমিরাল ওয়ার্টসন, উইলিয়াম ওয়াটস প্রমুখ। হেন দুষ্কর্ম নেই যা রাজ্য পাবার জন্যে ইংরেজরা করেনি। নবাবের কর আদায়কারীদের ঘুষ দেয়ার চল তারাই করেছিল। বাংলাদেশে ঘুষের প্রচলন তারাই সু-পরিকল্পিতভাবে প্রথম করেছিল। ইচ্ছে করে এবং চেষ্টা চরিত্র করে আমাদের দেশে এসব দুর্নীতি চালু করেছিল ইংরেজরাই প্রথম।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম বাগানে নবাবের বাহিনীর মুখোমুখি হল ইংরেজ বাহিনী। মীরজাফরের নেতৃত্বে কয়েকজন সেনাপতি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সুবিধাজনক হওয়ার পরেও যুদ্ধক্ষেত্রে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল। গুটিকয় ইংরেজ সৈন্যের হাতে নববের বিরাট বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। বাংলাদেশ ও বাঙালি দু'শো বছরের জন্যে ইংরেজের গোলাম হয়ে গেল। এরপর দীর্ঘদিন ধরে চলল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম।

সোনার বাংলাদেশ

এদেশে যে চিরটাকাল রাজত্ব করতে পারবে না, সেকথা ঠিকই বুঝেছিল ধূর্ত ইংরেজরা। তাই তারা অনেক আগে থেকেই ফন্দি ফিকির আঁটতে থাকে কী করে আরও বেশিদিন তাদের রাজত্বকে টিকিয়ে রাখা যায়। আর শেষ পর্যন্ত যদি এদেশ ছেড়ে পালাতেই হয়, তাহলে এমন ব্যবস্থার উপায় তারা খুঁজতে লাগল যাতে এদেশ দুর্বল হয়েই থাকে।

বাংলাদেশে প্রায় আটশো বছর ধরে হিন্দু আর মুসলমানরা পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। ইংরেজরা আসার আগে কোনোদিনও এই দু ধর্মের লোকদের মধ্যে কোনো মারামারি হয়েছে বলে জানা যায় না। কিন্তু ইংরেজদের আমলে এই প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হল সন্দেহ-

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঙালির ভাষা বাংলাকে যিনি সম্মানের সাথে বিশ্ব আসরে তুলে ধরেছিলেন
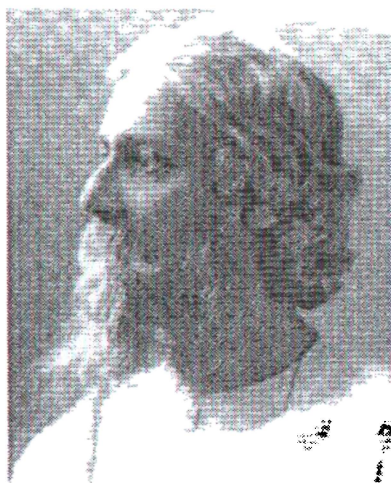
অবিশ্বাস-হানাহানি। এই অপকর্মের সমস্ত কলকাঠি নাড়ল ইংরেজরা। তারাই ছিল নাটের গুরু। তারা বুঝেছিল ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিলে এরা চিরটাকাল নিজেদের মধ্যে গোলমাল করা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তাদের বিরুদ্ধে যখনই এদেশের লোক সংগ্রাম শুরু করবে, তখনই তারা উস্কে দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবে। তখন নিজেদের ঝগড়া থামাবে, না ইংরেজের বিরুদ্ধে

লড়বে? দুই ধর্মের লোকদের মধ্যে যাতে চিরকালের জন্যে ঝগড়া থাকে সেজন্যে যা যা করা সম্ভব তার সবই করল ইংরেজরা। এর ফলে বাঙালি জাতিতে মারাত্মক বিভেদ সৃষ্টি হল। অনেক খুনোখুনি হল। বহু নিরাপরাধ মানুষ অকারণে প্রাণ দিল। জাতির এই মহাদুর্যোগের দিনে দাঙ্গার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর অনেকগুলো অমর সৃষ্টির পেছনেও রয়েছে দাঙ্গার কারণে পাওয়া কষ্টের

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা। তিনি তখন লিখেছিলেন বিখ্যাত "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার"। এটি একদিকে কবিতা অন্যদিকে গান। এমন গান বাঙালি আর কখনও শোনেনি। এটি দিনে দিনে হয়ে উঠল বাঙালির জাতীয় দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের গান। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো যতবারই জাতীয় দুর্যোগ এসেছে তখনই এই গান কাটিয়ে দিয়েছে হতাশা, এনেছে মনোবল। এতে তিনি লিখেছিলেন–

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা, হুঁশিয়ার!

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,

কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ!
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন!?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!

দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ সেই দুর্যোগের দিনে ইংরেজের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এ গান সজাগ করেছিল জাতিকে। আজও জাতিকে এ গান সতর্ক করে দেয়, ভবিষ্যতেও দেবে। মহৎ এ কবিতা-এই গান তাই বাঙালির চিরকালের সম্পদ। দাঙ্গাকে তিনি নিন্দা করেছেন। বিদ্রুপ করেছেন। আবার এর ভেতরেও চেয়েছেন যে জাতি জেগে উঠুক। কবির 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতায় তীব্র বিদ্রুপ আছে, তবে এর মধ্যেও জাতির জেগে ওঠার আশা আছে। 'ফনি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের এ কবিতায় তিনি লিখেছেন–

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া!
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন!
করুক কলহ– জেগেছে তো তবু-বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া!

সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিনে বাংলাদেশের আজকের রাজধানী শহর ঢাকাতেও বেধে গিয়েছিল দাঙ্গা। নজরুলের ভাষায় সেটা ছিল কুৎসিত দাঙ্গা। সে দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনি বিখ্যাত একটা কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতটার নাম 'ঢাকার দাঙ্গা'। কবিতাটির কয়েকটি লাইন পড়লেই বোঝা যায়, কবির মনে কী কষ্টই না লেগেছিল তখন। কবিতাটা ১৯৪১ সালের ১৩ অক্টোবর তারিখে সাপ্তাহিক 'নবশক্তি'তে ছাপা হয়েছিল। এর আগে তা নজরুল সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি আমরা আবারও পড়ি–

এল কুৎসিত ঢাকার দাঙ্গা আবার নাঙ্গা হয়ে;
এল হিংসার চিল ও শকুন নখর চক্ষু লয়ে।
সারা পৃথিবীর শ্মশানে ভূত-প্রেতাত্মা সর্ব্বনেশে
ঢাকার বক্ষে আখা জ্বালাইতে জুটিল কেমন এসে
এদের চিতার ধোঁয়া, ইহাদের বীভৎস চিৎকার
অরুণোদয়ের পূর্বাচলেরে করেছে অন্ধকার।
এরা কি মানুষ? এরা আল্লাহর সৃষ্টি হুঁশ নাই;
ডান হাত দিয়ে বাম হাত কাটে, ভায়েরে মারিছে ভাই।
আত্মহত্যা করিছে; বীরের মৃত্যু মরিত যারা,
মরণকালেও পাপ করে নিয়ে যায় অভিশাপ তারা।
এরা কি দৈত্য, রাক্ষস, জ্বিন, এসেছে পাতাল হতে;
কোন শয়তান টানিছে এদেরে এই নরকের পথে?

নিজ চোখে আজ দেখিতে পায় না আপন অকল্যাণ,
শান্তির নীড় অকারণে করে শ্মশান গোরস্থান!
ওদের অনাথ ছেলে ও মেয়েরে আশ্রয় দেবে কে?
কে দেবে অন্ন বস্ত্র ওদেরে বুকে তুলে নেবে কে?
বুঝিয়া বুঝে না, এ যে গুন্ডামী, এ নহে বীরের রণ;
চিরদিন ঘৃণা করিবে এদের ইতিহাস; জনগণ।
জাতির দেশের অকল্যাণের ইহারাই আজ হেতু,
বাঁধিতে দেয় না ইহারাই মহা-মিলনের প্রেম-সেতু।
কেহ লইবে না নাম ইহাদের কোন কালে কভু মুখে
ইহাদেরই আত্মজ ফিরাইবে মুখ লজ্জায় ও দুঃখে।
ভারতের এরা কলঙ্ক, হীন নির্লজ্জ ও জড়,
শয়তানে এরা চেনে না, আল্লা, অন্ধেরে দয়া কর।
ভোলাও এদের এই হিংসা ও বিদ্বেষ জাতি-ভেদ?
ক্লেদাক্ত হাতে অজ্ঞান করে আপনা উচ্ছেদ।
দয়া কর দয়া কর ইহাদের, চিরকল্যাণদাতা;
আপনা হাত দিয়ে কাটে এরা আপনা গলা মাথা।
এদের আঁখি বন্ধন খোলো, দেখাও প্রেমের জ্যোতি,
অপনারও নাশ করে, এরা করে মানবজাতিরও ক্ষতি।
কোন সে হিন্দু-মুসলমানের নেতা ইহাদের গুরু?

দগ্ধ কর সে 'নমরুদে' ভাঙো দুর্যোধনের উরু।
না, না, ওরা, অতবড় নয় ওরা গুণ্ডার সর্দার
উহাদের ঘাড়ে পড়ুক আল্লা তোমার চরম মার।
জাহান্নামের দূত ওরা শয়তানের গুপ্ত চেলা,
উহাদের চক্রান্তে মোদের আসে নাক ভোর বেলা,

নিঃশেষ করে দাও উহাদের পৃথিবীর বুক হ'তে,
তোমার অভয় লইয়া আবার মানুষ চলুক পথে।
শান্তি দাও, শান্তি দাও, হে ক্ষমাময়, ক্ষমা কর
হে, অভেদ, এই ভেদ ভুলাইয়া উদার বক্ষে ধর।
বাংলায় এই হিংস্রলীলা, ঢেকে দাও, ভেঙে দাও,
চির সুন্দর ক্ষমা প্রসন্ন নয়নে আবার চাও।

দেশের জাগরণে কবি-সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদ-শিল্পী-সাংবাদিক সবাই কাজ করলেন একসাথে। ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও আব্বাস উদ্দিন-এর মতো বহুজনের বহু শ্রম মিশে আছে সেই পথে। মহাডামাডোলের মধ্যেও তাই থেমে থাকল না ইংরেজ খেদানোর আন্দোলন। শেষে ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে পাত্‌তাড়ি গোটাতেই হল। এল ১৯৪৭ সালে। উপমহাদেশে সৃষ্টি হল ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটো আলাদা দেশ। আমাদের এই বাংলাদেশ পড়ল পাকিস্তানের অংশে।

তবে অল্পদিনের মধ্যেই বাঙালি বুঝল, তারা আবারও বিপদে পড়েছে। পাকিস্তানিরা সবসময় চেষ্টা করছে তাদেরকে ঠকাতে। গোটা পাকিস্তানে সংখ্যায় বেশি হলেও বাঙালিকে তারা কোনো অধিকারই দিতে চায় না। এমনকি বাঙালির মুখের ভাষা বাংলাকে পর্যন্ত তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে দিতে রাজি নয়। এজন্যে ১৯৫২ সালে বাঙালিকে রক্ত পর্যন্ত দিতে হল। এভাবেই বাঙালি প্রথম তার অধিকার আদায় করে ছাড়ল। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ-এরা বাঙালির জাতীয় সম্পদ। পাকিস্তানের শাসকরা চাইল বাঙালির মন থেকে এদেরকে মুছে দিতে। কিন্তু বাঙালি তা মেনে নিল না কিছুতেই। নিজেদের সংস্কৃতি এবং গৌরবের ইতিহাসকে রক্ষার জন্যে বাঙালির শুরু হল সংগ্রাম। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নেতারা। তবে
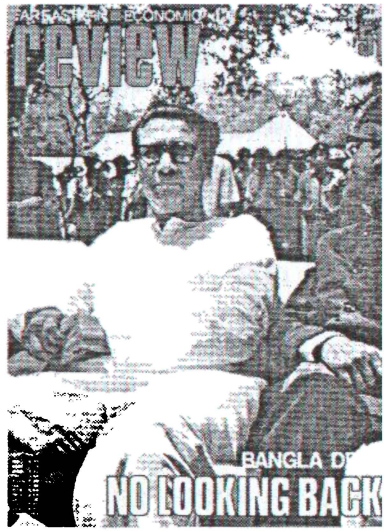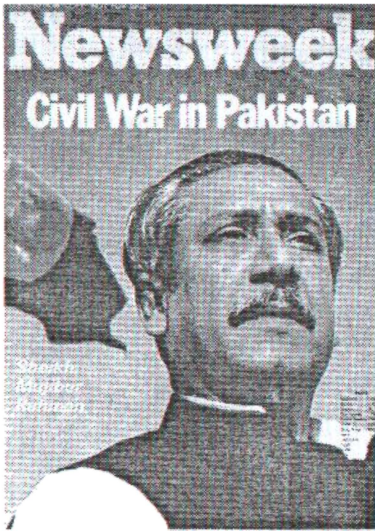
বাঁয়ে ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল তারিখের নিউজ উইক সাময়িকীর প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর ছবি, ডানে : ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখের ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ সাময়িকীর প্রচ্ছদে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এর ছবি।

সারাজীবন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করে, তাদের জেল-জুলুম-অত্যাচার সয়ে বাঙালি জাতির আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু।

অবশেষে ১৯৭০ সালে হল সাধারণ নির্বাচন। সে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিরা বিপুল বিজয় অর্জন করল। কিন্তু পাকিস্তানীরা অন্যায়ভাবে বঙ্গবন্ধুকে বঞ্চিত করল। তারা বাঙালিকে ক্ষমতা দিল না। উল্টো পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালির ওপর রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ অন্যায় বাঙালি নীরবে সহ্য করল না। বাঙালিও হাতে তুলে নিল অস্ত্র। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবেরপাড়ার আমবাগানে শপথ নিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। সেই থেকে জায়গাটার নাম হল মুজিবনগর। তবে সরকার গঠিত হয়েছিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল তারিখে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এ বছর ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতারে ভাষণ দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ এই সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সরকার গঠন অনুষ্ঠান সূচনায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সাবেক ই পি আর ও আনসার বাহিনীর দুটো প্লাটুন
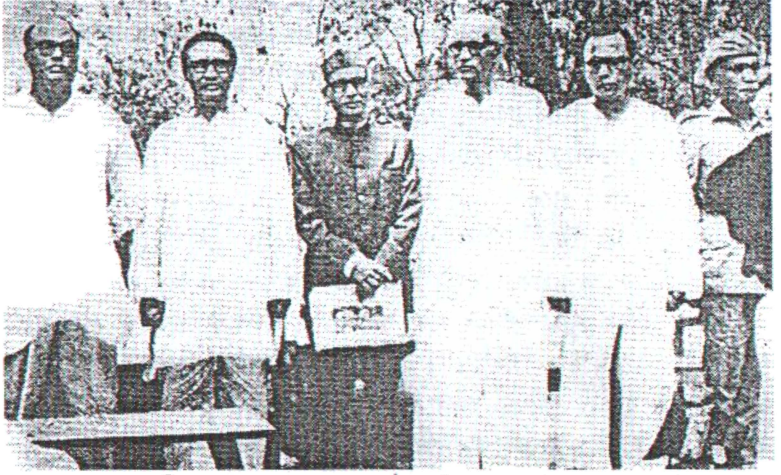
মেহেরপুরের মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাঁ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও আতাউল গণি ওসমানি

তওফিক এলাহী চৌধুরী ও মাহবুব উদ্দিন আহমদ-এর নেতৃত্বে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল) আতাউল গণি ওসমানি এম.এন.এ. নিযুক্ত হন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। কর্নেল আব্দুর রব এম.এন.এ. হন চিফ অব স্টাফ। এই সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মওলানা ভাসানী। তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন আহ্বায়ক। সদস্যরা ছিলেন– কমরেড মণি সিং, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, মনোরঞ্জন ধর ও খন্দকার মোশতাক আহমদ।

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সদস্যরা ছিলেন–

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০ খ্রি.-১৯৭৫ খ্রি.) রাষ্ট্রপতি
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫ খ্রি.-১৯৭৫ খ্রি.) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি (উপরাষ্ট্রপতি)
৩. তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫ খ্রি.-১৯৭৫ খ্রি.) প্রধানমন্ত্রী
৪. খন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৯ খ্রি.-১৯৯৬ খ্রি.) আইন, সংসদীয় ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী
৫. ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী (১৯১৯ খ্রি.-১৯৭৫ খ্রি.) অর্থমন্ত্রী
৬. এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান (১৯২৬ খ্রি.-১৯৭৫ খ্রি.) ত্রাণ ও পূর্নবাসন মন্ত্রী

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠ করা এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপস্থাপনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন দিনাজপুর থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

সেই মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর তদানিন্তন প্রধান এম.এ.জি. ওসমানি। সিলেটের তেলিয়াপাড়াতে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী সেনা কর্মকর্তাদের সাথে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক সভায় মিলিত হন এবং পরবর্তীতে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ১১ জুলাই তারিখে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে একটি সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের নেতৃত্ব দেয়া হয় একজন সেক্টর কমান্ডারকে। নিচে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহসহ ও সেক্টর কমান্ডারদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনো সেক্টরের কমান্ডারকে বিভিন্ন সময়ে বদল করা হয়েছিল। তার উল্লেখও এখানে করা হচ্ছে।

এক. ফেনী নদী থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম।
১. মেজর জিয়াউর রহমান জেড ফোর্সের অধিনায়ক (এপ্রিল/ ৭১ থেকে জুন ৭১ পর্যন্ত)।
২. মেজর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (ডিসেম্বর/ ৭১ পর্যন্ত)

দুই. ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, নোয়াখালী জেলা, আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা।
১. মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল/ ৭১ থেকে সেপ্টেম্বর/ ৭১ পর্যন্ত)।
২. মেজর এ টি এম হায়দার (ডিসেম্বর/ ৭১ পর্যন্ত)।

তিন. ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা জেলার অংশবিশেষ, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইনের উত্তর-পূর্ব অংশ সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা।
১. মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল/ ৭১ থেকে সেপ্টেম্বর/ ৭১ পর্যন্ত)
২. মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান (৯ ডিসেম্বর/ ৭১ পর্যন্ত)।

চার. সিলেট জেলার পূর্বাংশ এবং শায়েস্তাগঞ্জ-খোয়াই রেললাইন ছাড়া উত্তর ও পূর্ব দিকে সিলেট– ডউকি সড়ক পর্যন্ত।
১. মেজর সি আর দত্ত।

পাঁচ. সিলেট-ডউকি সড়ক থেকে শুরু করে সিলেট জেলার সম্পূর্ণ উত্তর ও পশ্চিমভাগ।
১. মেজর মীর শওকত আলী।

ছয়. দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা ও পুরো রংপুর জেলা।
১. উইং কমান্ডার এম কে বাশার।

সাত. রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলা এবং দিনাজপুর জেলার দক্ষিণভাগ।
১. মেজর কাজী নুরুজ্জামান।

আট. ফরিদপুর জেলার বেশিরভাগ এলাকা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কের উত্তরভাগ।
১. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল/ ৭১ থেকে আগস্ট/ ৭১ পর্যন্ত)।
২. মেজর এম এ মঞ্জুর (ডিসেম্বর/ ৭১ পর্যন্ত)।

নয়. গোটা বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা এবং সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণভাগ।
১. মেজর এম এ জলিল (ডিসেম্বর-এর প্রথমার্ধ/ ৭১ সাল পর্যন্ত)।
২. মেজর জয়নুল আবেদীন (ডিসেম্বর/ ৭১ এর শেষার্ধ)।
৩. মেজর এম এ মঞ্জুর (ডিসেম্বর/ ৭১ এর শেষার্ধে অতিরিক্ত সার্বিক দায়িত্ব)

দশ. বিভিন্ন সেক্টরে নৌ কমান্ডো অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব।
বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে নৌ কমান্ডো বাহিনীর দায়িত্ব পালন।
এগারো. ফুলছড়ি-বাহাদুরবাবাদ থেকে আরিচা-নগরবাড়ি পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীরবর্তী অঞ্চল, টাঙ্গাইল জেলা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে ময়মনসিংহ জেলা।
১. মেজর আবু তাহের (আগস্ট/ ৭১)।
২. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম. হামিদুল্লাহ্ (নভেম্বর/ ৭১-ডিসেম্বর/ ৭১)।

সেক্টর কমান্ডারদের প্রত্যেকেরই অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ অবদান ছিল মুক্তিযুদ্ধে। তাঁরা সবাই রণক্ষেত্রের বীর। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার। তাঁর নাম জিয়াউর রহমান। দেশের স্বাধীনতার জন্যে সাত বীরশ্রেষ্ঠসহ ত্রিশ লক্ষ শহিদ নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। অবশেষে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১

বাঁয়ে মুক্ত যশোরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ডানে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাঙালির উল্লাস

সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্ত হল বাংলাদেশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'– এই গান হল বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত, কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্' হয়েছে বাংলাদেশের রণসঙ্গীত। সারা পৃথিবীতে আজ গর্বের সাথে উড়ছে লাল সবুজ পতাকা– স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উড়ছে। শহিদের রক্তের রং বুকে নিয়ে উড়ছে যে পতাকা তা পেতে আমাদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করেছেন।